তফসীরে

মা'আরেফুল-কোরআন

দ্বিতীয় খণ্ড

[সূরা আলে-ইমরান থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত]

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র)

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবত জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্বমানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত, বিশুদ্ধতম ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনও সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্দেশনাগ্রন্থ, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যকভাবে অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোন বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য-বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী বিধায় সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমন কি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বস্তুত এই সমস্যা ও সুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে পবিত্র কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ-দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুফাসসিরে কুরআন, লেখক, গ্রন্থকার। ইসলাম সম্পর্কে, বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য উপমহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও খ্যাতিমান করেছে। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' একটি অনন্য ও অসাধারণ গ্রন্থ। উর্দু ভাষায় লেখা প্রায় সাড়ে সাত হাজার পৃষ্ঠার বিশ্বনন্দিত এই তফসীর গ্রন্থটি পাঠ করে যাতে বাংলাভাষী পাঠকগণ পবিত্র কুরআন চর্চায় আরো বেশি অনুপ্রাণিত হয় এবং পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী ও শিক্ষা অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারে, এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৮০ সাল থেকে এর তরজমার কাজ শুরু করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ প্রকল্পের আওতায় এ গ্রন্থটি তরজমার জন্য দেশের খ্যাতনামা আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি ৮ খণ্ডে তফসীরটির তরজমার কাজ সম্পন্ন করেন। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বিরচিত এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশের পরই ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে এ গ্রন্থের ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে এর সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এ গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম থেকে শুরু করে পরিমার্জন ও মুদ্রণের সকল পর্যায়ে যাঁরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন। বাংলাভাষী পাঠকগণ গ্রন্থটি পাঠের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের চর্চায় আরো বেশি মনোযোগী ও উৎসাহী হবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের এ প্রয়াস কবূল করুন। আমীন!

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম সংস্করণে অনুবাদকের আরয

بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

আল্লাহ্ তা'আলার হাজার শোকর যে অতি অল্প দিনের ব্যবধানেই তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন-এর দ্বিতীয় খণ্ড আগ্রহী পাঠকগণের সামনে তুলে ধরা সম্ভব হলো। আল্লাহ্র রহমতে আট খণ্ডে সমাপ্ত এ বিরাট তফসীর গ্রন্থখানির অনুবাদ অতি দ্রুত পাঠকদের খেদমতে পেশ করার তওফীক হয়।

এ যুগের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং সর্ববৃহৎ তফসীরগ্রন্থ মা'আরেফুল কোরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর একটা উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলম, সচিব জনাব মোঃ সাদেক উদ্দিন, প্রশাসক জনাব মেজর এরফানউদ্দিন প্রমুখের আগ্রহ এবং সক্রিয় সহযোগিতা কাজটি দ্রুত সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হচ্ছে। এঁদের এবং অন্যান্য যাঁরা বিভিন্নভাবে এ মহান গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের অশেষ কল্যাণ লাভের জন্য সকলের প্রতি দোয়ার আবেদন রইল।

২য় খণ্ড তরজমার ব্যাপারে আমাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছেন জনাব মাওলানা মু. আ. আযীয, জনাব মাওলানা আবদুল লতিফ মাহমুদী, জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া ও জনাব মাওলানা সৈয়দ জহীরুল হক। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, এ মহান তফসীর গ্রন্থের অনুবাদ কিংবা মুদ্রণের ক্ষেত্রে কোথাও যদি কোন অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয়, তবে তা অনুবাদককে অবহিত করে পরবর্তীতে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করতে সকলের প্রতি বিনীত আরয রইল।

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

সূচিপত্র

সূরা আলে-ইমরান	১
সব পয়গম্বরই তওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন	৪
দুনিয়ার মহব্বত	১৫
আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য	২১
'দীন' ও 'ইসলাম' শব্দের ব্যাখ্যা	২৩
ইসলামেই মুক্তি নিহিত	২৫
আহ্‌যাবের যুদ্ধ প্রসঙ্গ	৩০
ভাল ও মন্দের নিরিখ	৩১
অ-মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক	৩৬
পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনা	৪১
হযরত যাকারিয়া (আ)-র দোয়া	৪৮
হযরত ঈসা (আ) প্রসঙ্গ	৫২
ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র	৬৩
বিপদাপদ মু'মিনদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ	৬৭
কিয়াসের প্রামাণ্যতা	৬৯
মুবাহালা	৬৯
তবলীগের মূলনীতি	৭১
অ-মুসলমানের উত্তম গুণাবলী	৭৭
অঙ্গীকার ভঙ্গ করা	৭৮
পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ	৮০
আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার অঙ্গীকার	৮৩
মহানবী (সা)-র বিশ্বজনীন নবুয়ত	৮৫
ইসলামই মুক্তির পথ	৮৬
সৎপথে ব্যয় প্রসঙ্গ	৮৯
মধ্যপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন	৯২
কা'বা গৃহ নির্মাণ প্রসঙ্গ	৯৬
কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য	১০১
মকামে-ইবরাহীম	১০২
মুসলমানদের শক্তির ভিত্তি	১০৮
মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ	১১৭
ইজতিহাদ প্রসঙ্গ	১২৫
মুখমণ্ডল শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার অর্থ	১২৭
মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব	১৩১
ইহুদীদের প্রতি গযব ও লাঞ্ছনার অর্থ	১৩৪
মুসলমানদের সাফল্যের কারণ	১৪২
ওহুদ যুদ্ধ প্রসঙ্গ	১৪৪
বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান	১৫১
আল্লাহ্‌র পথে দান প্রসঙ্গ	১৬৮
সাহাবায়ে-কিরামের মর্যাদা	১৮৪
ওহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য	১৮৯
এক পাপ অপর পাপের কারণ হতে পারে	১৯০
সাহাবায়ে-কিরামের ব্যাপারে একটি শিক্ষা	১৯১
মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ	১৯৫
পরামর্শ গ্রহণ প্রসঙ্গ	১৯৮
গনীমতের মাল অপহরণ	২১৩
মহানবী (সা)-র আগমন	২১৫
ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়ের কারণ	২১৬
শহীদগণের মর্যাদা	২১৭
ইহ্‌সানের সংজ্ঞা	২২৩
তাকওয়া বা পরহিযগারীর সংজ্ঞা	২২৩
ইলমে-গায়েব প্রসঙ্গ	২৩০
কার্পণ্য প্রসঙ্গ	২৩৫
আখিরাত চিন্তা	২৩৭
দীনী ইলমের দায়িত্ব	২৪০
আসমান-যমীন সৃষ্টির অর্থ	২৪৪
হিজরত ও শাহাদত	২৫৫
রিবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষা	২৫৬
সূরা নিসা	২৫৯
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক	২৬২
মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ	২৬৭
নাবালেগের বিবাহ	২৬৮
বহু-বিবাহ	২৬৮
সম্পদের হিফাযত জরুরী	২৮৪
বালেগ হওয়ার বয়স	২৮৭
ধর্মীয় ও জাতীয় খেদমতের পারিশ্রমিক	২৮৯

উত্তরাধিকার স্বত্ব ২৯২
ইয়াতীমের মাল গ্রাস করার পরিণাম ২৯৭
মীরাস বন্টন ৩০৭
ব্যভিচারের শাস্তি ৩১৯
ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গোনাহ্ ৩২৩
তওবার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ৩২৫
নারীর অধিকার ৩২৮
যাদের সাথে বিবাহ হারাম ৩৩৫
মৃতার অবৈধতা ৩৪৫
নিজের সম্পদ অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা ৩৫৭
বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদ খাওয়া ৩৫৭
হালাল পন্থাসমূহ ৩৫৯
পাপের প্রকারভেদ ঃ সগীরা ও কবীরা গোনাহ্ ৩৬২
অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা ৩৬৮
চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির অংশ ৩৭২
নারী-পুরুষের কর্মবিভাগ ৩৭৭
না-ফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধন ৩৭৯
দাম্পত্য জীবনে মতবিরোধ দেখা দিলে ৩৮২
সালিসের মাধ্যমে বিবাদ মীমাংসা করা ৩৮৪
পিতা-মাতার হক ৩৮৮
আত্মীয়ের হক ৩৯০
ইয়াতীম-মিসকীনের হক ৩৯১
প্রতিবেশীর হক ৩৯১
সহকর্মীদের হক ৩৯২
শরাব প্রসঙ্গ ৪০৩
তায়াম্মুমের হুকুম ৪০৪
শিরকের কয়েকটি দিক ৪১১
তাগূত-এর বর্ণনা ৪১৩
আল্লাহ্র লা'নত প্রসঙ্গ ৪১৫
ইহুদীদের হিংসা ৪২০
আমানত প্রসঙ্গ ৪২৪
সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতি ৪৩১
ইজতিহাদ ও কিয়াস ৪৩৫
রসূলে করীমের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব ৪৪২
জান্নাতে পদমর্যাদা ৪৪৮
সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহীন ৪৫২
উৎপীড়িতের সাহায্য ৪৫৮
জিহাদের নির্দেশ ৪৬৪
তাওয়াক্কুল ৪৬৭
নেতৃত্বদানকারীদের প্রতি হেদায়েত ৪৭১
কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা ৪৭১
যুগ-সমস্যা সম্পর্কে ইজতিহাদ ৪৭৬
সুপারিশ ঃ বিধি ও প্রকারভেদ ৪৮০
সালাম ও ইসলাম ৪৮৪
হিজরতের বিধান ৪৯৪
হত্যার বিধান ৪৯৮
কিবলার অনুসারীকে কাফির না বলার তাৎপর্য ৫০৪
জিহাদ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান ৫০৫
সফর ও কসরের বিধান ৫১৫
কোরআন ও সুন্নাহ্র তাৎপর্য ৫২৪
মুসলমান বনাম আহ্লে-কিতাব ৫৩৩
আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি ৫৩৫
দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় নির্দেশ ৫৪০
ইনসাফ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ৫৫২
আল্লাহ্-ভীতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ৫৫৪
ন্যায়-নীতির পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ৫৫৬
মান-মর্যাদা আল্লাহ্রই হাতে ৫৬২
মনগড়া তফসীরবিদদের মজলিসে বসা জায়েয নয় ৫৬৫
কুফরীর প্রতি মৌন সম্মতি ও কুফরী ৫৬৭
একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই ৫৭৪
হযরত ঈসা (আ) প্রসঙ্গ ঃ
সন্দেহ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল ৫৮১
ঈসা (আ)-এর পুনরাগমন ৫৮৬
দুনিয়ার মহব্বতের সীমা ৬০২
সুন্নত ও বিদ'আতের সীমারেখা ৬০৩
ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সম্মান ৬০৩
আল্লাহ্র বান্দা হওয়া সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় ৬০৬

সূরা আলে-ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ, ২০০ আয়াত, ২০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿٣﴾
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ
فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক। (৩) তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে; যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। নাযিল করেছেন তওরাত ও ইন্‌জীল, (৪) এ কিতাবের পূর্বে, মানুষের হেদায়েতের জন্য এবং অবতীর্ণ করেছেন মীমাংসা। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। (৬) তিনিই সেই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য অংশটুকু কোরআনের তৃতীয় সূরা আলে-ইমরানের প্রথম রুকূর। সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সূরা ফাতিহার শেষভাগে আল্লাহ্‌র নিকট সরল পথ প্রার্থনা করা হয়েছিল। এরপর সূরা বাক্বারায় الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ বলে শুরু

করে যেন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সূরা ফাতিহার প্রার্থিত সরল পথের প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলা মঞ্জুর করে এ কোরআন পাঠিয়েছেন। এ কোরআন সরল পথ প্রদর্শন করে। অতঃপর সূরা বাক্বারায় শরীয়তের অনেক বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন জায়গায় কাফিরদের বিরোধিতা ও তাদের সাথে মোকাবিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ---(অর্থাৎ কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর)। এরূপ দোয়া দ্বারা সূরা শেষ করা হয়েছে। সেই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে সূরা আলে-ইমরানে সাধারণভাবে কাফিরদের সাথে কাজ-কারবার এবং তাদের বিরুদ্ধে হাতে ও মুখে জিহাদ করার কথা বর্ণিত হচ্ছে। এটা যেন وانصرنا على القوم الكافرين বাক্যেরই ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যে মহান লক্ষ্যের জন্য মানবজাতিকে কুফর ও ইসলাম তথা কাফির ও মুমিন এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় এবং তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তা-ই সূরা আলে-ইমরানের প্রথম পাঁচ আয়াতে উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ মহান লক্ষ্যটি হচ্ছে আল্লাহ্র তওহীদ বা একত্ববাদ। যারা তওহীদে বিশ্বাস করে তারা মু'মিন এবং যারা বিশ্বাস করে না, তারা কাফির বা অ-মুসলিম। এ রুকূর প্রথম আয়াতে তওহীদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ এবং দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ—الٓمٓ ۝ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

এতে الم শব্দটি কোরআনের বিশেষ রহস্যপূর্ণ আয়াতসমূহের অন্যতম। এটি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা)-এর মধ্যকার একটি গোপন রহস্য। এ রুকূর শেষ আয়াত-সমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে। এরপর اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বাক্যে তওহীদের বিষয়বস্তুকে একটি দাবীর আকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ্র সত্তা এমন যে, তাঁকে ছাড়া উপাসনা করার যোগ্য কেউ নেই।

অতঃপর الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ—বলে তওহীদের যুক্তিগত প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। কারও সামনে আপন সত্তাকে চূড়ান্ত অক্ষম ও হীনরূপে উপস্থাপিত করার নাম ইবাদত। বলা বাহুল্য ইবাদতের যোগ্য সত্তাকে অসীম শক্তিধর ও চূড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী এবং সবদিক দিয়ে চরম পরাকাষ্ঠাশীল হতে হবে। পক্ষান্তরে যে বস্তু আপন সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে অক্ষম কিংবা অপরের মুখাপেক্ষী, তার শক্তি ও সম্মান যে নিতান্তই নগণ্য তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। কাজেই একথা সুস্পষ্ট যে, জগতে যেসব বস্তু আপন সত্তার মালিক নয় এবং আপন সত্তাকে কায়েম রাখতে অক্ষম তা প্রস্তর-নির্মিত মূর্তিই হোক অথবা পানি ও বৃক্ষই হোক অথবা ফেরেশতা কিংবা পয়গম্বরই হোক—তারা কেউ ইবাদতের

যোগ্য নয়। একমাত্র সেই পরম সত্তাই ইবাদতের যোগ্য হতে পারেন, যিনি চিরঞ্জীব ও চির অস্তিত্বশীল। বলা বাহুল্য, সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই সত্তা। তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝

এর সারমর্ম এই যে, কোরআন-বর্ণিত তওহীদের বিষয়বস্তুটি কোরআন অথবা এই পয়গম্বর (সা)-এরই বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এর পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তওরাত, ইন্‌জীল এবং অনেক পয়গম্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের সবাই এ তওহীদের অনুসারী এবং প্রচারক ছিলেন। কোরআন এসে তাঁদের সবার সত্যায়ন করেছে, কোন নতুন দাবী উপস্থাপন করেনি, যা হৃদয়ঙ্গম করতে অথবা মেনে নিতে মানুষ জটিলতার সম্মুখীন হবে।

সর্বশেষ দু'আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার দুটি অনন্য গুণ ইল্‌ম (জ্ঞান) ও কুদরত (শক্তি-সামর্থ্য) দ্বারা তওহীদের প্রমাণ সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ যে সত্তা সর্বব্যাপী জ্ঞানের অধিকারী এবং যাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করে আছে, একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। অসম্পূর্ণ জ্ঞান বা সীমিত শক্তির অধিকারী কোন সত্তা এ স্তরে উপনীত হতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীর এরূপ ঃ

আলিফ-লাম-মীম (এর অর্থ আল্লাহ্ জানেন)। আল্লাহ্ তা'আলা এমন যে, তিনি ছাড়া ইবাদত করার যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর নিয়ামক। তিনি আপনার প্রতি কোরআন নাযিল করেছেন সত্যতা সহকারে। এ কোরআন ঐসব (খোদায়ী) গ্রন্থের সত্যায়ন করে, যা ইতিপূর্বে ছিল। (এমনিভাবে) তিনি তওরাত ও ইনজীল প্রেরণ করেছিলেন ইতিপূর্বেকার লোকদের হেদায়েতের জন্য (এতে কোরআন যে হিদায়েত, সে কথাও স্বাভাবিকভাবেই সপ্রমাণিত হয়। কারণ, হিদায়েতের সত্যায়নকারীও হিদায়েত।) আল্লাহ্ তা'আলা (পয়গম্বরগণের সত্যতা প্রমাণের জন্য) মু'জিযা প্রেরণ করেছেন। নিশ্চয়ই যারা (একত্ববাদ প্রমাণকারী) নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য রাখেন)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোন কিছু গোপন নয়; পৃথিবীতেও (না) এবং নভোমণ্ডলেও (না)। তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ। তিনি এমন (পবিত্র) সত্তা যে, যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের (আকৃতি) গঠন করেন। (কারও আকার এক রকম, কারও আকার অন্য রকম। সুতরাং তাঁর শক্তি-সামর্থ্যও পরিপূর্ণ। জীবন নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি প্রধান বৈশিষ্ট্য এককভাবে তাঁর মধ্যেই

বিদ্যমান রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে,) তাঁর (পবিত্র) সত্তা ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি শক্তিধর, (তওহীদ অস্বীকারকারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু) পরম বিজ্ঞ (ও। তাই বিশেষ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার জীবনে কর্মের প্রতিফল না দিয়ে কিছুটা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সর্বকালে সব পয়গম্বরই তওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন ঃ দ্বিতীয় আয়াতে তওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে পৌঁছারও কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যে-ই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা বলেন এবং সবাই একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরণত আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাঁর তওহীদের পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর বংশধরদের মধ্যেও এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম-সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার পর হযরত নূহ (আ) আগমন করেন। তিনিও মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কিত ঐসব তত্ত্বের প্রতিই দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব বিষয়ের প্রতি আদম আলাইহিস্ সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস্ সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরাও হুবহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এরপর মূসা ও হারূন আলাইহিমুস্ সালাম এবং তাঁদের বংশের পয়গম্বরগণ আগমন করেন। তাঁরা সবাই সে একই কলেমায়ে-তওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কলেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এর পরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত ঈসা (আ) সেই একই আহ্বান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) একই তওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।

মোটকথা, হযরত আদম থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাঁদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক পয়গম্বর অন্য পয়গম্বরের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তাঁর দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন। বরং সচরাচর তাঁদের একজন অন্যজন থেকে বহু শতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কোন অবস্থা তাঁদের জানা থাকারও কথা নয়। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই

তাঁরা পূর্বসূরিগণের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই তাঁদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্য নিযুক্ত করা হয়।

এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করে না, সে যদি খোলা মনে, সরলভাবে চিন্তা করে যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মানুষ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে একই সত্যের কথা বর্ণনা করলে তা মিথ্যা হতে পারে কি? তবে এতটুকু চিন্তাই তার পক্ষে তওহীদের সত্যতা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য কি না, তা যাচাই করারও প্রয়োজন থাকে না। বরং বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণকারী এত বিপুল সংখ্যক লোকের এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু পয়গম্বরগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সততা ও সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারও পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, তাঁদের বাণী ষোল আনাই সত্য এবং তাঁদের দাওয়াতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত।

প্রথমদিকের দুই আয়াতে বর্ণিত তওহীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে—কিছু সংখ্যক খৃস্টান একবার হুযুর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাদের সামনে তওহীদের দু'-একটি প্রমাণ উপস্থিত করলে খৃস্টানরা নিরুত্তর হয়ে যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও তওহীদের বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে যে, এ জ্ঞান থেকে কোন জাহানের কোন কিছু গোপন নয়।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অন্ধকার পর্যায়ে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন! তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণবিন্যাসে অমন শিল্পীসুলভ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে এমন মিল খায় না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের যুক্তিসঙ্গত দাবী এই যে, ইবাদত একমাত্র তাঁরই করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়।

এভাবে তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার প্রধান চারটি 'সিফাত' চারটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার সিফাত এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত সর্বব্যাপী জ্ঞান ও সার্বিক শক্তি-সামর্থ্যের সিফাত বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ চারটি গুণেই যে সত্তা গুণান্বিত, একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ

الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ
اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ
رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧

(৭) তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তন্মধ্যকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে ঃ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তিসম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী চার আয়াতে তওহীদ প্রমাণ করা হয়েছিল। এ আয়াতে তওহীদের বিপক্ষে কতিপয় আপত্তির উত্তর দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নাজরানের কিছুসংখ্যক খৃস্টান রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দীন সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তিনি বিস্তারিতভাবে খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করে আল্লাহ্র একত্ববাদ প্রমাণ করেন। তিনি স্বীয় দাবীর সমর্থনে আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, আল্লাহ্ পরিপূর্ণ শক্তিধর, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ইত্যাদি গুণবাচক বাক্য উপস্থাপন করেন। খৃস্টানরা এসব বাক্যের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এভাবে একত্ববাদ প্রমাণিত হয়ে গেলে ত্রিত্ববাদের অসারতাও প্রমাণিত হয়ে যায়। এরপর খৃস্টানরা কোরআনে ব্যবহৃত কিছু শব্দ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলে যে, কোরআনে হযরত ঈসা (সা)-কে 'রূহুল্লাহ্' (আল্লাহ্র আত্মা) এবং 'কালেমাতুল্লাহ্' (আল্লাহ্র বাক্য) বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, ইবাদতের যোগ্য হওয়ার ব্যাপারে তিনি আল্লাহ্র অংশীদার।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা খৃস্টানদের এসব মন্তব্যের মূলোৎপাটন করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআনের এসব বাক্য 'মুতাশাবিহাত' অর্থাৎ রূপক। এসব বাক্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা)-এর মধ্যকার একটা গোপন রহস্য। এগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্বসাধারণ অবগত হতে পারে না, বরং এসব শব্দের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সর্বসাধারণের জন্য বৈধ নয়। এগুলো সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী যে, এসব বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার যা উদ্দেশ্য, তা সত্য। এর অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করার অনুমতি নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। এর এক অংশ এমন সব আয়াত, যা উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত (অর্থাৎ এসব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট)। এ আয়াতগুলো (এ) গ্রন্থের (কোরআনের) আসল ভিত্তি। (অর্থাৎ এসব আয়াত দ্বারা অস্পষ্ট আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট করা হয়। অপর অংশ এমন সব আয়াত, যেগুলোর উদ্দেশ্য অস্পষ্ট। (অর্থাৎ এসব আয়াতের অর্থ অস্পষ্ট—তা সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণেই হোক অথবা সুস্পষ্ট আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যহীন হওয়ার কারণেই হোক।) অতএব, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা ঐ অংশের পেছনে পড়ে, যার উদ্দেশ্য অস্পষ্ট (দীনের ব্যাপারে), গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এর (অস্পষ্ট আয়াতে ভ্রান্ত) অর্থ অন্বেষণের দুরভিসন্ধিতে (যাতে স্বীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসে এর সাহায্য নেওয়া যায়)। অথচ এসব আয়াতের অভ্রান্ত অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেউ জানে না (অথবা তিনি যদি নিজে কোরআন কিংবা হাদীসের মাধ্যমে পরিষ্কার কিংবা ইঙ্গিতে বলে দেন। যেমন, صلوة শব্দের উদ্দেশ্য পরিষ্কার জানা হয়ে গেছে এবং اِسْتِوَاء عَلَى الْعَرْشِ [আরশের ওপর সোজা হয়ে উপবেশন] ইত্যাদির যথার্থ মর্ম খুবই সুস্পষ্ট। সুতরাং "আল্লাহ্ তা'আলা আরশে সমাসীন"—এ কথাটার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার শান মোতাবেকই হবে—এ তথ্য মোটামুটি সবারই জানার কথা। কিন্তু আরশে সমাসীন হওয়ার প্রকৃতি কিরূপ, তা সাধারণের জানার কথা নয়। তেমনি কোরআনের একক বর্ণসমূহ যথা—-আলিফ, লাম, মীম ইত্যাদির অর্থ কেউ জানতে পারেনি। যেমন জানতে পারা যায়নি استواء على العرش এর প্রকৃত তাৎপর্য।) এবং (এ কারণেই) যারা (ধর্মীয়) জ্ঞানে পরিপক্ক (এবং সমঝদার), তারা (এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে) বলে ঃ আমরা (সংক্ষেপে) বিশ্বাস রাখি যে, সবই (অর্থাৎ সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট সব আয়াত) আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে (আগত। সুতরাং বাস্তবে এগুলোর যে অর্থ ও উদ্দেশ্য, তা সত্য)। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান। (অর্থাৎ বুদ্ধির দাবীও এই যে, উপকারপ্রদ ও জরুরী বিষয়ে মনোনিবেশ করা দরকার এবং অপকারী ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের পেছনে লেগে থাকা অনুচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বা রূপক আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মূলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ মূলনীতিটিও বুঝে নেওয়ার পর অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর ব্যাখ্যা এরূপ ঃ কোরআন মজীদে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে 'মুহ্কামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে 'মুতাশাবিহাত' তথা অস্পষ্ট ও রূপক আয়াত বলা হয়।

আরবী ভাষার নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যে সব আয়াতে অর্থ সুস্পষ্ট-রূপে বুঝতে পারে, সে সব আয়াতকে মুহ্‌কামাত বলে এবং এরূপ ব্যক্তি যেসব আয়াতের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝতে সক্ষম না হয়, সেসব আয়াতকে মুতাশাবিহাত বলে।—(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা 'উম্মুল-কিতাব' আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতা থেকে মুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখতে হবে। যে অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। এ ব্যাপারে স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা কোন ব্যাখ্যা অথবা কদর্থ লওয়া শুদ্ধ হবে না। উদাহরণত হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ ঃ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

(সে আমার নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়)। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ। আল্লাহ্ সৃষ্টি করে-ছেন মৃত্তিকা থেকে।

এসব আয়াত এবং এই প্রকার অন্যান্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত বান্দা এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব 'তিনি উপাস্য', 'তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র',—খৃস্টানদের এসব দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট।

এখন যদি কেউ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু 'আল্লাহ্‌র বাক্য' এবং 'আল্লাহ্‌র আত্মা' ইত্যাদি অস্পষ্ট আয়াত সম্বল করে হঠকারিতা শুরু করে দেয় এবং এগুলোর এমন অর্থ নেয়, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও পরম্পরাগত বর্ণনার বিপরীত, তবে একে তার বক্রতা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি বলা যায়?

কারণ, অস্পষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভুল উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনিই কৃপা ও অনুগ্রহবশত যাকে যতটুকু ইচ্ছা জানিয়ে দেন। সুতরাং এমন অস্পষ্ট আয়াত থেকে কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় নিয়ে স্বমতের অনুকূলে কোন অর্থ বের করা শুদ্ধ হবে না।

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ—এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ-স্বভাবসম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাঁটাঘাঁটি করে না, বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস স্থাপন করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহ্‌র

সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হিকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেন নি। প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অস্পষ্ট আয়াতসমূহের তথ্যানুসন্ধানে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে এদের কথাই উল্লেখ করেছেন।—(বুখারী, ২য় খণ্ড)

অপর এক হাদীসে বলেন ঃ আমি উম্মতের ব্যাপারে তিনটি বিষয়ে শঙ্কিত। প্রথম, অধিক অর্থপ্রাপ্তির ফলে তারা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়, আল্লাহ্র গ্রন্থ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ অনুবাদের মাধ্যমে প্রত্যেক সাধারণ ও মূর্খ ব্যক্তিও কোরআন বোঝার দাবীদার হয়ে যাবে)। এতে যেসব বিষয় বোঝার যোগ্য নয় অর্থাৎ অস্পষ্ট আয়াত, মানুষ সে সবের অর্থ উদ্‌ঘাটনে সচেষ্ট হবে। অথচ আল্লাহ্ ব্যতীত এগুলোর সঠিক অর্থ কেউ জানে না। তৃতীয়, মুসলমানগণ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ত্বরিত উন্নতি লাভ করার পর পুনরায় তার অবনতি ঘটবে। অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের স্পৃহা ও জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা পরিত্যক্ত হবে। ফলে ইল্‌ম ধীরে ধীরে ক্ষয় পাবে।—(ইবনে-কাসীর)

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ—'জ্ঞানে গভীরতার অধিকারী' কারা ? এ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকতর গ্রহণ-যোগ্য উক্তি এই যে, এরা হলেন আহ্‌লুস্ সুন্নাতে-ওয়াল-জমাআত। তাঁরা কোরআন ও সুন্নাহ্র সে-ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ মনে করেন, যা সাহাবায়ে-কিরাম, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা থেকে বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে কোর-আনী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন এবং অস্পষ্ট আয়াতসমূহের যেসব অর্থ তাঁদের বোধগম্য নয়, নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য স্বীকার করে সেগুলোকে তাঁরা আল্লাহ্র নিকটই সোপর্দ করেন। তারা স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তির জন্য গর্বিত নন, বরং সর্বদা আল্লাহ্র কাছে দৃঢ়তা ও অধিকতর জ্ঞান-গরিমা ও অন্তর্দৃষ্টি কামনা করতে থাকেন। তাঁদের মন-মস্তিষ্ক অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহী নয়। তাঁরা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস এই যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস থেকে আগত। তবে এক প্রকার অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ জানা আমাদের জন্য উপকারী ও জরুরী ছিল, এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা গোপন রাখেন নি, বরং খোলাখুলি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ হিকমতের কারণে বর্ণনা করেন নি। কাজেই তা জানা আমাদের জন্যে জরুরী নয়। সংক্ষেপে এরূপ আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট।—(মাযহারী)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ
رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ۝٨ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا
رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝٩

(৮) হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ-প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করো না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সবকিছুর দাতা। (৯) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে সত্যপন্থীদের একটি বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তারা শিক্ষাগত পূর্ণতা অর্জন সত্ত্বেও উদ্ধত নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরো ঈমানী দৃঢ়তার জন্য দোয়া করেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আরো একটি নিষ্ঠাপূর্ণ গুণের কথা বর্ণনা করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে আমাদের পালনকর্তা! (সত্যের দিকে) আমাদের পথ-প্রদর্শনের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করবেন না এবং নিজের কাছ থেকে আমাদের (বিশেষ) রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা। (বিশেষ রহমত এই যে, আমরা যেন সোজাপথে কায়েম থাকি)। হে আমাদের পালনকর্তা! (আমরা বক্রতা থেকে আত্মরক্ষার এবং সৎপথে কায়েম থাকার এই দোয়া জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করি না, বরং পরকালের মুক্তির জন্য করি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস এই যে,) নিশ্চিতই আপনি মানবমণ্ডলীকে (হাশরের ময়দানে) একত্র করবেন ঐ দিনে, যাতে (অর্থাৎ যার আগমন সম্পর্কে) বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে। সন্দেহ না থাকার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ দিনের আগমনের ওয়াদা করেছেন। আর) নিশ্চিতই আল্লাহ্ ওয়াদার খেলাফ করেন না। (তাই কিয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী। আমরা তজ্জন্য চিন্তিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথমে আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পথ-প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টতা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ্ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তরকে সৎকাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন। আর যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার অন্তরকে সোজাপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

রসূল (সা) বলেন ঃ এমন কোন অন্তর নেই, যা আল্লাহ্ তা'আলার দুই অঙ্গুলীর

মাঝখানে নয়। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সৎপথে কায়েম রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, সৎপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

তিনি যথেচ্ছ ক্ষমতাশীল। যা ইচ্ছা তাই করেন। কাজেই, যারা ধর্মের পথে কায়েম থাকতে চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর দৃঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্য দোয়া করে। হুযুর (সা) সর্বদাই অনুরূপ দোয়া করতেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিম্নরূপ একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে ঃ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك

অর্থাৎ হে অন্তর আবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে তোমার দীনের ওপর দৃঢ় রাখ।---(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿١١﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ
وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾

(১০) যারা কুফ্‌রী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন। (১১) ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহ্‌র আযাব অতি কঠিন। (১২) কাফিরদিগকে বলে দাও, খুব শিগ্‌গিরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে—সেটা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল!

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চিতই যারা কুফ্‌রী করে, আল্লাহ্‌র সামনে তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বিন্দু পরিমাণেও কাজে আসবে না। এরূপ লোকেরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। (তাদের ব্যাপারটি এরূপ,) যেরূপ ব্যাপার ছিল ফেরাউন গোষ্ঠী এবং তাদের পূর্ববর্তী (কাফির-দের) (সে ব্যাপার ছিল এই যে) তারা আমার নিদর্শনাবলীকে (অর্থাৎ সংবাদ ও বিধি-বিধানকে) মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপের কারণে তাদের পাকড়াও করেন। (আল্লাহ্ তা'আলার পাকড়াও বড় কঠোর। কারণ, তাঁর অবস্থা এই যে) তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। (যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে,

তাদেরও তেমনি শাস্তি হবে)। আপনি কাফিরদের (আরও) বলে দিন ঃ (তোমরা মনে করবে না যে, শুধু পরকালেই এ পাকড়াও হবে। বরং ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই হবে। সেমতে ইহকালে) অতি সত্বর তোমাদের (মুসলমানদের হাতে) পরাজিত করা হবে এবং (পরকালে) জাহান্নামের দিকে একত্র করে নেওয়া হবে। জাহান্নাম খুবই মন্দ ঠিকানা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ—এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফিররা পরাজিত ও পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফিরকে পরাভূত দেখি না; এর কারণ কি? উত্তর এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফির বোঝানো হয় নি, বরং তখনকার মুশরিক ও ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিযিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۭ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ۭ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

(১৩) নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফিরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের দ্বারা শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের পরাজিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে প্রমাণ হিসেবে এর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় তোমাদের (প্রমাণের) জন্য বড় নমুনা রয়েছে দুই দলের (ঘটনার) মধ্যে, যারা পরস্পর (বদর যুদ্ধে) একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছিল। একদল (অর্থাৎ মুসলমান) আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করছিল এবং অন্য দল ছিল কাফির। (কাফিরদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে,) কাফিররা নিজ (দল)-কে মুসলমানদের চেয়ে কয়েক গুণ (বেশী) দেখছিল। (দেখাও ধারণা-কল্পনায় দেখা নয়, বরং) চাক্ষুষ দেখা (যার বাস্তবতা

সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কাফিরদের সংখ্যা এত বেশী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের জয়ী করেন। আসলে জয়-পরাজয় আল্লাহ্র হাতেই)। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তিদান করেন। (অতএব) নিঃসন্দেহে এতে (অর্থাৎ এ ঘটনায়) চক্ষুষ্মানদের জন্য বড় সাবধানবাণী (ও দৃষ্টান্ত) রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে কাফিরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাতশত উট ও একশত অশ্ব ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উট, দুইটি অশ্ব, ছয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারি ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, 'প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের আধিক্য কল্পনা করে কাফিরদের অন্তর উপর্যুপরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্র ওয়াদা إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ (যদি তোমাদের মধ্যে একশত ধৈর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে)-এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহ্র সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফিরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেতো, তবে তাঁদের মনে ভয়ভীতি সঞ্চার হওয়ার আশংকা ছিল। উভয়-পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ মনে হওয়ায় অবস্থাটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। সূরা আনফালে এ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে।

মোট কথা, মক্কায় প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি স্বল্প সংখ্যক ও নিরস্ত্র দলকে বিরাট বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। —(ফাওয়ায়েদে-আল্লামা উসমানী)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ

الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۭ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ
اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٦﴾ الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَ
الْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾

(১৪) মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদিপশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্‌র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (১৫) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো?—যারা পরহিযগার, আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জন্যে রয়েছে বেহেশ্‌ত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত—তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ্‌ তাঁর বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন। (১৬) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ্‌ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (১৭) তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলাম ও ঈমানের বিরোধিতাই যে যাবতীয় অসৎ কর্মের মূল কারণ, তাই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এর উৎস হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত। কেউ যশ ও অর্থের লোভে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, কেউ কুপ্রবৃত্তির কারণে এবং কেউ পৈতৃক প্রথার প্রতি অন্ধ আবেগ পোষণের কারণে সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এসবের সারমর্ম হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

প্রিয় বস্তুর ভালবাসা (অনেক) মানুষের মনে তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে। (উদাহরণত) রমণী, সন্তান-সন্ততি, পুঞ্জীভূত স্বর্ণ ও রৌপ্য, চিহ্নযুক্ত অশ্ব, (অথবা অন্যান্য পালিত) পশু ও শস্যক্ষেত্র। (কিন্তু) এগুলো সব পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক বস্তু। পরিণামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ সুন্দর বস্তু) তো আল্লাহ্‌র কাছেই আছে (যা মৃত্যুর পর

কাজে আসবে। পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে)। আপনি (তাদের) বলে দিন, আমি কি তোমাদের এমন জিনিস বলে দেব, যা (বহুগুণে) উত্তম (উল্লেখিত) এসব বস্তু থেকে? (তবে শোন,) যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাদের জন্য তাদের (প্রকৃত) প্রভুর কাছে এমন বাগান (অর্থাৎ বেহেশ্‌ত) রয়েছে, যার তলদেশে ঝরনা প্রবাহিত হয়। এতে (বেহেশ্‌তে) তারা চিরকাল বসবাস করবে, আর (তাদের জন্য) এমন সঙ্গিনী রয়েছে, যারা (সর্বপ্রকারে) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর (তাদের জন্য) রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আল্লাহ্‌ তা'আলা ভালোভাবে দেখেন বান্দাকে (অর্থাৎ বান্দার অবস্থাকে। তাই যারা ভয় করে, তাদের এসব নিয়ামত দেবেন। পরবর্তী আয়াতে তাদের কিছু গুণ উল্লেখ করা হচ্ছে। তারা এমন লোক) যারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, আমাদের সমস্ত গোনাহ্‌ মাফ কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। (তারা) ধৈর্যশীল, সত্যপরায়ণ, বিনম্র, (সৎকাজে) অর্থ ব্যয়কারী এবং শেষরাতে (জাগ্রত হয়ে) ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার মহব্বত ঃ হাদীসে বলা হয়েছে حب الدنيا رأس كل خطيئة (দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল)। প্রথম আয়াতে দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান কাম্য বস্তুর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে,---মানুষের দৃষ্টিতে এ সবের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। আয়াতে যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনার লক্ষ্যস্থল। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে রমণী ও পরে সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনে। এরপর উল্লেখ করা হয়েছে সোনা, রূপা, পালিত পশু ও শস্যক্ষেতের কথা। কারণ এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও প্রিয় বস্তু।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্যক্ষেতে কাজ করতে অথবা মজুরি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও কায়িক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত হতো না। মানব-স্বভাবে এসব বস্তুর প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই এসব বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার পর শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের চিন্তায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধনী ব্যক্তি কিছু পয়সা খরচ করে শ্রমিক যোগাড় করার চিন্তায় বের হয়। ব্যবসায়ী উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে

গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে---যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায়। এদিকে গ্রাহক অনেক কষ্টার্জিত পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বাজারে পৌঁছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এসব প্রিয়বস্তুর ভালবাসাই সবাইকে আপন আপন গৃহ থেকে বের করে আনে এবং এ ভালবাসাই দুনিয়া জোড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিচালন-ব্যবস্থাকে মজবুত ও দৃঢ় একটা নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় রহস্য এই যে, জাগতিক নিয়ামতের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালবাসা না থাকলে পারলৌকিক নিয়ামতের স্বাদ জানা যেতো না এবং তৎপ্রতি আকর্ষণও হতো না। এমতাবস্থায় সৎকর্ম করে জান্নাত অর্জন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করতো না।

এখানে অধিকতর প্রণিধানযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি অর্থাৎ এসব বস্তুর ভালবাসা স্বভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মশগুল হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এ সবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অবগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে। কোরআন মজীদের অন্য এক আয়াতে এ রহস্যটিই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -

অর্থাৎ আমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে পৃথিবীর সৌন্দর্যরূপে সৃষ্টি করেছি---যাতে মানুষের পরীক্ষা নিতে পারি যে, কে তাদের মধ্যে উত্তম কর্ম সম্পাদন করে।

এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, জগতের মোহনীয় বস্তুগুলোকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেওয়াও আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। এর রহস্য অনেক। কিন্তু কোন কোন আয়াতে সুশোভিত করে দেওয়া শয়তানের কাজ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণত زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ-অর্থাৎ শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দিয়েছে। এসব আয়াতের অর্থ এমন বস্তুকে সুশোভিত করা, যা শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে মন্দ অথবা সীমাতিরিক্ত লোভনীয় করার কারণে মন্দ। নতুবা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়কে সুশোভিত করা মন্দ নয়, বরং এতে অনেক উপকারও নিহিত আছে। এ কারণেই কোন কোন আয়াতে এই সুশোভিত করাকে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্র কাজ বলা হয়েছে।

মোট কথা এই যে, জগতের সুস্বাদু ও মোহনীয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা কৃপাবশত মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তৎপ্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, মানুষের পরীক্ষা নেওয়া। বাহ্যিক কাম্যবস্তু ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বাদে মশগুল হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আল্লাহ্ তা'আলা তা দেখতে চান। এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ্কে

স্মরণ করে এবং এগুলোকে তাঁর মা'রেফত ও মহব্বত লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, তবে বলা যায় যে, সে দুনিয়াতেও উপকৃত হয়েছে এবং পরকালেও সফলকাম হবে। জগতের লোভনীয় বস্তু তার পথের কাঁটা হওয়ার পরিবর্তে তার পথপ্রদর্শক এবং সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে স্রষ্টাকে, পরকালে তাঁর সম্মুখে উপস্থিতিকে এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে যে, এসব বস্তুই তার পারলৌকিক জীবনের ধ্বংস ও অনন্তকাল শাস্তি ভোগের কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেও এসব বস্তু তার শাস্তির কারণ ছিল। এ ধরনের মানুষ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

অর্থাৎ আপনি কাফিরদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হবেন না। কারণ, অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়াতে এসব অবাধ্যদের কোন উপকার হয়নি। বরং এসব অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আখিরাতে তো তাদের শাস্তির কারণ হবেই, দুনিয়াতেও দিবা-রাত্রির চিন্তা ও ব্যস্ততার কারণে এগুলো এক ধরনের শাস্তি বৈ আর কিছু নয়।

মোট কথা, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এবং যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে ইহকাল ও পরকালের কামিয়াবী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা বৈধ পন্থায় হলেও সেগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে। মওলানা রূমী এ বিষয়টির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ

آب اندر زیر کشتی پشتی است ــ آب در کشتی هلاک کشتی است

অর্থাৎ "দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম পানির মত এবং এতে মানুষের অন্তর একটি নৌকার মত। পানি যতক্ষণ নৌকার নিচে ও আশেপাশে থাকে, ততক্ষণ তা নৌকার জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে পানি যদি নৌকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে তাই নৌকাডুবি ও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।"

এমনিভাবে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ যতক্ষণ মানুষের অন্তরে প্রাধান্য বিস্তার না করে, ততক্ষণ তা মানুষের ইহকাল ও পরকালের জন্য উপকারী ও সহায়ক। পক্ষান্তরে অর্থ-সম্পদ যদি মানুষের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবেই তার অন্তরের মৃত্যু ঘটে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

অর্থাৎ এসব বস্তু হচ্ছে পার্থিব জীবনে ব্যবহার করার জন্য ; মন বসাবার জন্য নয়। আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। অর্থাৎ যেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নিয়ামত ধ্বংস হবে না, হ্রাসও পাবে না।

পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কিত আরও ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ○

এতে হুযূর (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ যারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরও উৎকৃষ্টতর নিয়ামতের সন্ধান বলে দিচ্ছি। যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র অনুগত, তারাই এ নিয়ামত পাবে। সে নিয়ামত হচ্ছে সবুজ বৃক্ষলতাপূর্ণ বেহেশ্‌ত, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তাতে থাকবে সকল প্রকার আবিলতামুক্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি।

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ রমণীকুল, সন্তান-সন্ততি, সোনা ও রূপার ভাণ্ডার, উৎকৃষ্ট অশ্ব, পালিত জন্তু ও শস্যক্ষেত। এদের বিপরীতে পরকালের নিয়ামতরাজির মধ্যে বাহ্যত তিনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম—জান্নাতের সবুজ বাগ-বাগিচা ; দ্বিতীয়—পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনীগণ এবং তৃতীয়—আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। অবশিষ্টগুলোর মধ্যে সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে দুই কারণে মানুষ সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসে। প্রথমত, সন্তান-সন্ততি পিতার কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতার নামটুকু থেকে যায়। কিন্তু পরকালে কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই এবং মৃত্যুও নেই যে, কোন অভিভাবক অথবা উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হবে। এছাড়া দুনিয়াতে যার সন্তান-সন্ততি আছে, সে জান্নাতে তাদেরকে পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় যার সন্তান নেই, প্রথমত জান্নাতে তার মনে সন্তানের বাসনাই হবে না। আর কারও মনে বাসনা জাগ্রত হলে আল্লাহ্‌ তাকে তাও দান করবেন। তিরমিযীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেন ঃ কোন জান্নাতীর মনে সন্তানের বাসনা জাগ্রত হলে সন্তানের গর্ভাবস্থা, জন্মগ্রহণ ও বয়োপ্রাপ্তি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার মনের বাসনা পূর্ণ করা হবে।

এমনিভাবে জান্নাতে সোনা-রূপার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এই যে, দুনিয়াতে

সোনা-রূপার বিনিময়ে দুনিয়ার আসবাবপত্র ক্রয় করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু এর মাধ্যমেই যোগাড় করা যায়। কিন্তু পরকালে ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রয়োজন হবে না এবং কোন কিছুর বিনিময়ও দিতে হবে না। বরং জান্নাতীর মন যখন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া জান্নাতে সোনা-রূপার কোন অভাব নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে কোন কোন প্রাসাদের এক ইট সোনার ও এক ইট রূপার হবে। মোট কথা. পরকালের হিসাবে সোনা-রূপাকে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই মনে করা হয়নি।

এমনিভাবে দুনিয়াতে ঘোড়ার কাজ হলো বাহন হয়ে পথের দূরত্ব অতিক্রম করা। জান্নাতে সফর ও যানবাহন প্রভৃতি কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শুক্রবার দিন জান্নাতীদের আরোহণের জন্য উৎকৃষ্ট ঘোড়া সরবরাহ করা হবে। এগুলোতে সওয়ার হয়ে জান্নাতীরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে যাবে।

মোট কথা, জান্নাতে ঘোড়ারও কোন উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই। এমনিভাবে পালিত পশু কৃষিক্ষেত্রে কাজে আসে অথবা তা দুগ্ধ দান করে। জান্নাতে দুগ্ধ ইত্যাদি পশুর মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা দান করবেন।

কৃষিকাজের অবস্থাও তদ্রূপ। দুনিয়াতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করা হয়। জান্নাতে সকল প্রকার শস্য আপনা-আপনি সরবরাহ হবে। কাজেই সেখানে কৃষিকাজের প্রয়োজনই নেই। তবুও যদি কেউ কৃষিকাজকে ভালবাসে, তবে তার জন্য সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তিবরানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে এক ব্যক্তি কৃষিকাজের বাসনা প্রকাশ করবে। তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। অতঃপর শস্যের বপন, রোপণ, পাকা ও কর্তন কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এসব কারণেই জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে শুধু জান্নাত ও জান্নাতের হুরদের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, জান্নাতীদের জন্য কোরআনে এ ওয়াদাও রয়েছে যে, ولهم ما يشتهون অর্থাৎ "তারা যে বাসনাই প্রকাশ করবে, তাই পাবে।" এহেন ব্যাপক ঘোষণার পর বিশেষ কোন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি ? তা সত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেক জান্নাতী চাওয়া ছাড়াই পাবে অর্থাৎ জান্নাতের সবুজ বাগ-বাগিচা, অপরূপ সুন্দরী রমণীকুল। এগুলোর পর আরও একটি সর্ববৃহৎ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানুষ এর কল্পনাও করে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ সন্তুষ্টি। এরপর অসন্তুষ্টির কোন আশঙ্কা থাকবে না। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে পৌঁছে আনন্দিত ও নিশ্চিত হয়ে যাবে এবং তাদের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাদের সম্বোধন করে বলবেন ঃ এখন তোমরা সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হয়েছ। আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই তো ? জান্নাতিগণ আরয করবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এত নিয়ামত দান করেছেন যে, এরপর আর কোন নিয়ামতের প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ এখন আমি তোমাদের সব নিয়ামত থেকে উৎকৃষ্ট একটি নিয়ামত দিচ্ছি।

তা এই যে, তোমরা সবাই আমার অশেষ সন্তুষ্টি লাভ করেছ। এখন অসন্তুষ্টির আর কোন আশঙ্কা নেই। কাজেই জান্নাতের নিয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেওয়ার অথবা হ্রাস করে দেওয়ারও কোন আশঙ্কা নেই।

এ দু'টি আয়াতের সারমর্মই হুযুর (সা) বলেছেন ঃ

الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ما ابتغى به وجه الله
وفى رواية الا ذكرالله وما والاه اوعالما او متعلما ـ

—দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তাও অভিশপ্ত। তবে ঐসব বস্তু নয়, যদ্দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়। এক রিওয়ায়তে আছে—তবে আল্লাহ্র যিকির এবং আল্লাহ্র পছন্দনীয় বস্তু অথবা আলিম কিংবা তালেবে ইল্ম এ অভিশাপের আওতামুক্ত।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا
بِالْقِسْطِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ
الْاِسْلَامُ ۣ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا
جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۭ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

---

(১৮) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানিগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও, মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষের বশবর্তী হয়েই। যারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতেও একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তওহীদের বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গত তওহীদের ওপর তিনটি সাক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এক—স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য ; দুই—ফেরেশতাগণের সাক্ষ্য ; এবং তিন—বিশেষ জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাক্ষ্য। আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্য রূপক অর্থে বুঝতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী এবং সমুদয় সৃষ্টি একত্ববাদের উজ্জ্বল নিদর্শন।

هر گیاهے کہ اززمین روید — وحدہ لاشریک لہ گوید

—মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন প্রতিটি তৃণও একত্ববাদ উচ্চারণ করে।

এছাড়া তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল ও গ্রন্থাবলীও একত্ববাদের সাক্ষ্যদাতা। এসব বস্তু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত। কাজেই স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই যেন সাক্ষ্য দেন যে, তাঁকে ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নাই।

দ্বিতীয় সাক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে ফেরেশতাগণের। ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত এবং তাঁর সৃষ্টিগত সকল ক্রিয়াকর্মের কর্মী বাহিনী। তাঁরা সব কিছু জেনে-শুনে এবং চাক্ষুষ দেখে সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই।

তৃতীয় সাক্ষ্য বিশেষ জ্ঞানীদের। এ বিশেষ জ্ঞানী বলতে সব পয়গম্বর এবং মুসলমান আলিম শ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই ইমাম গাযালী এবং আল্লামা ইবনে-কাসীর বলেনঃ এ আয়াতে আলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাক্ষ্যকে নিজের এবং ফেরেশতাগণের সাথে উল্লেখ করেছেন। এখানে বিশেষ জ্ঞানী বলতে সম্ভবত ঐসব মনীষীকেও বোঝানো হয়েছে, যাঁরা বিশুদ্ধ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অথবা সৃষ্ট জগত সম্পর্কে গভীর গবেষণার ফলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হন যে, এ সৃষ্ট জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই রয়েছেন এবং তিনি একক, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোন সত্তা নেই। যদি তাঁরা অন্যান্য শর্ত মাফিক আলিম শ্রেণীভুক্ত নাও হন, তাতেও কিছু যায় আসে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র ইসলাম ধর্মই গ্রহণযোগ্য হওয়া এবং এ ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয় বর্ণনা করে একত্ববাদের বিষয়বস্তুকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। যারা এ বিষয়ের সাথে একমত নয়, তাদের অশুভ পরিণতির কথাও দ্বিতীয় আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ (খোদায়ী গ্রন্থসমূহে) এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁর (পবিত্র) সত্তা ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। আর ফেরেশতাগণ (স্বীয় যিক্‌র ও প্রশংসা কীর্তনে এর সাক্ষ্য দিয়েছেন। কারণ তাদের যিক্‌র একত্ববাদের বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ)। আর (অন্যান্য) বিদ্বানগণ (স্বীয় বক্তৃতা ও রচনাবলীতে এর সাক্ষ্য দিয়েছেন)। ইলাহ্‌ও এমন যে, (প্রত্যেক বস্তুর) পরিমিত ব্যবস্থাপনা কায়েম রেখেছেন। (এরপর বলা হয় যে), তিনি ছাড়া ইবাদত পাওয়ার যোগ্য কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ। নিশ্চিতই (সত্য ও গ্রহণযোগ্য) ধর্ম আল্লাহ্‌র কাছে একমাত্র ইসলাম। (এ ধর্ম সত্য হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে) আহলে-কিতাবরা যে মতবিরোধ করেছে (যে, ইসলামকে তারা অসত্য ধর্ম বলেছে), তা তাদের কাছে (ইসলামের) সত্যতার প্রমাণ পৌঁছে যাবার পর পরস্পর বিদ্বেষ এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়ার কারণে করেছে। (অর্থাৎ ইসলাম সত্যধর্ম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন কারণ নেই। বরং

তাদের মধ্যে একে অন্যকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাবার প্রবণতা আছে। ইসলাম গ্রহণ করলে জনগণের উপর তাদের সরদারী নষ্ট হয়ে যায়। তাই তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং উল্টা ইসলামকে অসত্য আখ্যা দিয়েছে।) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান অস্বীকার করে (যেমন, তারা করেছে), নিশ্চিতই আল্লাহ্ অতিসত্বর তার হিসাব নেবেন (এরূপ ব্যক্তির হিসাবের পরিণাম শাস্তিই হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَهِدَ اللّٰهُ ..... আয়াতের ফযীলত ঃ এই আয়াতের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইমাম বগভী বলেন, সিরিয়া থেকে দুইজন বিশিষ্ট ইহুদী আলিম একবার মদীনায় আগমন করেন। মদীনার লোকালয় তথা আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যেরূপ লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, এটা ঠিক সেরূপ লোকালয় বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে। তাঁরা হযরত নবী করীম (সা) -এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলী তাঁদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাঁরা বললেন ঃ আপনি কি মুহম্মদ ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি মুহম্মদ এবং আমি আহ্‌মদ। তাঁরা আরও বললেন ঃ আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো। হযরত নবী করীম (সা) বললেন ঃ প্রশ্ন করুন। তাঁরা বললেন, আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোন্‌টি ? এ প্রশ্নের উত্তরে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম (সা) আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাঁদের শুনিয়ে দিলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান।

মসনদে-আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত পাঠ করার পর বললেন ঃ

وانا على ذلك من الشاهدين يا رب—অর্থাৎ পরওয়ারদেগার। আমিও এর সাক্ষ্যদাতা।—(ইবনে-কাসীর)

ইমাম আ'মাশের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এ আয়াত পাঠ করার পর যে ব্যক্তি انا على ذلك من الشاهدين—বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদের বলবেন ঃ আমার এ বান্দা একটি অঙ্গীকার করেছে। আমি সবচাইতে বেশী অঙ্গীকার পূর্ণ করি। তাই আমার বান্দাকে জান্নাতে স্থান দাও।

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বর্ণিত এক হাদীসে হযরত নবী করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল-কুরসী شهد الله আয়াত এবং قل اللهم مالك الملك থেকে بغير حساب পর্যন্ত পাঠ করে, আল্লাহ্

তা'আলা তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতে স্থান দেবেন। এ ছাড়া তিনি তার সত্তরটি প্রয়োজন মেটাবেন। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হবে মাগফেরাত। —(রূহুল মা'আনী)

'দীন' ও 'ইসলাম' শব্দের ব্যাখ্যা ঃ আরবী ভাষায় دِيْن শব্দের একাধিক অর্থ বর্তমান। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কোরআনের পরিভাষায় دِيْن ঐসব মূল-নীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয়, যা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। 'শরীয়ত' অথবা 'মিনহাজ' শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। 'মাযহাব' শব্দটি দীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয় যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোরআন বলে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ঐ দীনই জারি করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ্ ও অন্যান্য পয়গম্বরকে দেওয়া হয়েছিল।

এতে বোঝা যায় যে, সব পয়গম্বরের দীনই এক ও অভিন্ন ছিল অর্থাৎ আল্লাহ্র সত্তার যাবতীয় পরাকাষ্ঠার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকারোক্তি করা, কিয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জান্নাত ও দোযখের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকারোক্তি করা, আল্লাহ্র প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রসূল ও তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের প্রতিও তেমনিভাবে ঈমান আনা।

'ইসলাম' শব্দের আসল অর্থ আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের আনুগত্য করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নূহ (আ) বলেন ঃ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ আমি 'মুসলিম' হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।—(সূরা ইউনুস)। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

হযরত ঈসা (আ)-র সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল ঃ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ —সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।—(আলে-ইমরান ঃ ৫২)

সাধারণত ঐ দীন ও শরীয়তকেই 'ইসলাম' বলা হয়, যা নিয়ে সবার শেষে হযরত মুহাম্মদ (সা) আগমন করেছেন এবং যা বিগত সব শরীয়তকে রহিত করে দিয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যে দীন ও শরীয়ত কায়েম থাকবে। এ অর্থের দিক দিয়ে 'ইসলাম' শব্দটি দীনে মুহাম্মদী ও উম্মতে-মুহাম্মদিয়ার এক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়ে যায়। সব হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসে-জিবরাঈলে হযরত নবী করীম (সা) ইসলামের এ বিশেষ অর্থটিই বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য আয়াতের 'ইসলাম' শব্দেও উপরোক্ত উভয় অর্থই নেওয়া যেতে পারে। প্রথম অর্থ নিলে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এরূপঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম ধর্ম অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহর অনুগত করা, প্রত্যেক যুগে আগত রসূল ও তাঁদের আনীত বিধি-বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তা পালন করা। এতে যদিও দীনে মুহাম্মদীর কোন বিশেষত্ব নেই, তথাপি সাধারণ নীতি অনুযায়ী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর তাঁর প্রতি ও তাঁর আনীত বিধি-বিধানের প্রতি ঈমান আনা ও তা পালন করাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর সারমর্ম এই হবে যে, নূহ (আ)-এর আমলে তাঁর আনীত ধর্মই ছিল গ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম (আ)-এর আমলে তাঁর আনীত ধর্মই ছিল গ্রহণযোগ্য। মূসা (আ)-র আমলে তওরাতের পাতা ও তার শিক্ষার আকারে যা এসেছিল, তাই ছিল গ্রহণযোগ্য ইসলাম। ঈসা (আ)-র আমলে গ্রহণযোগ্য ইসলাম ইনজীল ও খৃস্টীয় বাণীর রঙে রঞ্জিত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। সবার শেষে খাতামুল-আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আমলে কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্দেশিত ধর্মবিধানই হবে গ্রহণযোগ্য ইসলাম।

মোট কথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দীনই ছিল দীনে ইসলাম এবং আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দীনে-মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেওয়া হয় অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর আনীত ধর্ম, তবে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ (সা)-এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য-শীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে। অতএব, উভয় অবস্থাতে আয়াতের সার অর্থ একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম ঐ ইসলাম, যা সেই পয়গম্বরের ওহী ও শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেটা ছাড়া অন্য কোন ধর্মই গ্রহণযোগ্য নয়—যদিও তা বিগত কালের রহিত ধর্মও হয়ে থাকে। পরবর্তী কালের জন্য তা আর ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য থাকে না। ইবরাহীম (আ)-এর কালে তাঁর ধর্ম ছিল ইসলাম, মূসা (আ)-র যমানায় সেই ধর্মের যেসব বিধান রহিত হয়ে যায়, তা ইসলাম নয়। তেমনিভাবে ঈসা (আ)-র আমলে মূসা (আ)-র শরীয়তের কোন বিধান রহিত হয়ে থাকলে তা তখন ইসলাম ছিল না। ঠিক এমনিভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমলে পূর্ববর্তী শরীয়তের যেসব বিধান রহিত রয়েছে, তা এখন ইসলাম নয়। তাই কোরআনের সম্বোধিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোন অর্থই নেওয়া হোক না কেন, সারমর্ম হবে এই যে, রসূল (সা)-এর আবির্ভাবের পর

কোরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য—অন্য কোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে। এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে ঃ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه—অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অবলম্বন করে, তা তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না। এ ধর্মের অধীনে যেসব ক্রিয়াকর্ম করা হবে, তাও বরবাদ হবে।

ইসলামেই মুক্তি নিহিত ঃ আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফ্‌র ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোন ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে—সে ইহুদী হোক, খৃস্টান হোক অথবা মূর্তিপূজারীই হোক। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ, এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। এটা একটা কাল্পনিক বিষয়, যা কুফ্‌রের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেরূপ এক হতে পারে না, তদ্রূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বরগণের শত্রু ঃ প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর দৃষ্টিগোচর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোন কর্ম ধর্তব্য নয়। কোরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন আমল ওজন করব না।

আলোচ্য আয়াতে ও তৎপূর্ববর্তী আয়াতসমূহে গ্রন্থধারীদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাই তাদের নির্বুদ্ধিতা ও কুকর্ম এভাবে বর্ণিত হচ্ছে ঃ

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۝

অর্থাৎ গ্রন্থধারীরা যে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত ও ইসলাম সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করেছে, এর কারণ এই নয় যে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ আছে ঃ তওরাত, ইনজীল ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের পুরাপুরি জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও ধনৈশ্বর্যের মোহ তাদেরকে বিরোধে লিপ্ত করেছে।

পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, আল্লাহ্ দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর পর প্রথমত কবর তথা বরযখ-জগতে পরকালের পথে প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হবে। এরপর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে কিয়ামতে। এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে উঠবে। মিথ্যাপন্থীরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্তিও আরম্ভ হয়ে যাবে।

فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۭ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۭ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝۲۰

(২০) যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, 'আমি এবং আমার অনুসরণকারিগণ আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।' আর আহ্লে-কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আর আল্লাহ্র দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।

যোগসূত্র ঃ সূরার প্রারম্ভে একত্ববাদ প্রমাণিত ও ত্রিত্ববাদ খণ্ডন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিক ও অবিশ্বাসী গ্রন্থধারীদের বাদানুবাদের জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, ইসলাম সত্য ধর্ম) এর পরও যদি তারা আপনার সাথে (অনর্থক) বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ (তোমরা স্বীকার কর বা না-ই কর) আমি আপন মুখমণ্ডল বিশেষভাবে আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেছি আর যারা আমার অনুসারী, তারাও (স্বীয় মুখমণ্ডল আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেছে। অর্থাৎ আমরা সবাই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেছি। ইসলামে বিশ্বাসের দিক দিয়ে অন্তর আল্লাহ্র দিকেই নিবিষ্ট থাকে। কারণ, অন্যান্য ধর্মে কিছু কিছু শির্ক দেখা দিয়েছিল। এ উত্তরের পর জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে) গ্রন্থধারী ও মুশরিকদের বলুন ঃ তোমরাও ইসলামে দীক্ষিত হবে কি? যদি তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়, তবে তারাও (সৎ) পথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা (এ থেকে যথারীতি) মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে (আপনি এ জন্যও চিন্তিত হবেন না। কারণ), আপনার দায়িত্ব শুধু (আল্লাহ্র বিধান) পৌঁছিয়ে দেওয়া। (পরে)

আল্লাহ্ নিজেই স্বীয় বান্দাদের দেখে (ও বুঝে) নেবেন (আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না)।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

(২১) যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (২২) এরাই হলো সে লোক, যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

যোগসূত্র ঃ সূরার প্রারম্ভে অধিকাংশই খৃস্টানদের সম্বোধন করা হয়েছিল। এরপর পূর্ববর্তী أُوتُوا الْكِتَابَ আয়াতে খৃস্টান ও ইহুদী—উভয় সম্প্রদায়ই শামিল ছিল। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইহুদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হচ্ছে। ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়তক্রমে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত নবী করীম (সা) বলেন ঃ বনী-ইসরাঈল একই সময়ে ৪৩ জন পয়গম্বরকে হত্যা করেছিল। এরপর এ দুষ্কর্মের জন্য ১৭০ জন ধার্মিক ব্যক্তি তাদের উপদেশ দিতে উদ্যোগী হলে তারা তাঁদেরও হত্যা করে।— (বয়ানুল কোরআন, রূহুল মা'আনী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে (যেমন ইহুদীরা ইনজীল ও কোরআন অস্বীকার করে) এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করে (আর এ হত্যা তাদের ধারণায়ও) অন্যায়ভাবে আর এমন লোকদেরও হত্যা করে, যারা (কর্ম ও চরিত্রে) মিতাচার শিক্ষা দেয়, এরূপ লোকদের কষ্টদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন। তারাই ঐ লোক, যাদের (উপরোক্ত অপকর্মের কারণে) সব (সৎ) কর্ম বরবাদ হয়ে গেছে দুনিয়াতে (ও) এবং (পরকালেও)। (শাস্তি দেওয়ার সময়) তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ

اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٣﴾
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ
وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ
لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۖ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

(২৩) আপনি কি তাদের দেখেন নি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে—আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি তাদের আহ্‌বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তা এ জন্য যে, তারা বলে থাকে ঃ দোযখের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না; তবে সামান্য হাতেগোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারাই তারা ধোঁকা খেয়েছে। (২৫) কিন্তু তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি তাদেরকে একদিন সমবেত করবো—যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। আর নিজেদের কৃতকর্ম তাদের প্রত্যেকেই পাবে—তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেই অন্যায় করা হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মুহাম্মদ [সা]!) আপনি কি তাদের দেখেন নি, যাদের (খোদায়ী) গ্রন্থের (অর্থাৎ তওরাতের) একটি (যথেষ্ট) অংশ দেওয়া হয়েছিল (হেদায়েত কামনা করলে এ অংশই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো)। এ গ্রন্থের দিকে তাদের আহ্বানও করা হয়, যাতে এটি তাদের (ধর্মীয় মতবিরোধের) মীমাংসা করে দেয়। অতঃপর তাদের এক-দল অমনোযোগী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এর (অর্থাৎ অমনোযোগিতার) কারণ এই যে, তারা বলে ঃ (এবং তাদের বিশ্বাসও তাই যে,) আমরা গোনাগুণতির অল্প কয়েক দিন মাত্র দোযখে থাকবো। (এরপর মাগফিরাত হয়ে যাবে। এ) মনগড়া বিশ্বাসই তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। যেমন এ বিশ্বাস তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে যে, তারা পয়গম্বরগণের বংশধর। এ বংশগত মাহাত্ম্যের কারণে তাদের মাগফেরাত অবশ্যই হয়ে যাবে। এর ফলে তারা আল্লাহ্‌র গ্রন্থের প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করতে থাকে)। অতএব (এসব কুফ্‌রী কাজকর্ম ও কথাবার্তার কারণে) তাদের অবস্থা খুবই মন্দ হবে, যখন আমি তাদের ঐ দিনে একত্র করবো যাতে (অর্থাৎ যার আগমনে) কোন সন্দেহ নেই। (ঐ দিনে) প্রত্যেকেই পুরাপুরি প্রতিদান পাবে—কারও প্রতি অন্যায় করা হবে না (অর্থাৎ বিনাদোষে অথবা দোষের চাইতে বেশী শাস্তি দেওয়া হবে না)।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ
مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ
فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

(২৬) বলুন, 'ইয়া আল্লাহ্! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। (২৭) তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি দোয়া ও মুনাজাত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর ভেতরেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। আয়াতের 'শানে-নযুল' থেকে তাই বোঝা যায়। একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণকে সংবাদ দেন যে, অদূর ভবিষ্যতে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানগণের করতলগত হবে। এতে মুনাফিক ও ইহুদীরা বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতে থাকলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। —(রূহুল মা'আনী)

(হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহ্র কাছে) বলুনঃ হে আল্লাহ্! সাম্রাজ্যের মালিক আপনি। সাম্রাজ্য (অর্থাৎ সাম্রাজ্যের যতটুকু অংশ) যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যার (অধিকার) থেকে চান সাম্রাজ্য (অর্থাৎ সাম্রাজ্যের অংশ) ছিনিয়ে নেন। যাকে আপনি চান জয়ী করে দেন এবং যাকে চান পরাজিত করে দেন। আপনার হাতেই সব মঙ্গল নিহিত। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর ওপর সমর্থবান। আপনি (কোন ঋতুতে) রাতকে (অর্থাৎ রাতের অংশকে) দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন (ফলে দিন বড় হতে থাকে)। এবং (কোন কোন ঋতুতে) দিনকে (অর্থাৎ দিনের অংশকে) রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন (ফলে রাত বড় হতে থাকে)। আপনি প্রাণীকে প্রাণহীন বস্তুর ভেতর

থেকে বের করেন (যেমন ডিম থেকে বাচ্চা) এবং প্রাণহীন বস্তু প্রাণী থেকে বের করেন (যেমন পাখী থেকে ডিম)। আপনি যাকে চান অপরিমিত রিযিক দান করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের শানে-নযুল ঃ মুসলমানদের অব্যাহত উন্নতি ও ইসলামের ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখে বদর যুদ্ধে পরাজিত এবং ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত মুশরিক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই সকলে মিলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব ব্যবহার করতে প্রস্তুত হচ্ছিল। অবশেষে দেশময় গভীর ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিক, ইহুদী ও খৃস্টানদের একটি সম্মিলিত শক্তিজোট গড়ে উঠলো। তারা সবাই মিলে মদীনার উপর ব্যাপক আক্রমণ ও চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলো। সাথে সাথে তাদের অগণিত সৈন্য দুনিয়ার বুক থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার সংকল্প নিয়ে মদীনার চারদিক অবরোধ করে বসলো। কুরআনে এ যুদ্ধ 'গযওয়ায়ে আহ্যাব' অর্থাৎ সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ এবং ইতিহাসে 'গযওয়ায়ে খন্দক' নামে উল্লিখিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করেছিলেন যে, শত্রু-সৈন্যের আগমন পথে মদীনার বাইরে পরিখা খনন করা হবে।

বায়হাকী, আবূ নাঈম ও ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, প্রতি চল্লিশ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব প্রতি দশজন মুজাহিদ সাহাবীর ওপর সোপর্দ করা হয়। পরিকল্পনা ছিল---কয়েক মাইল লম্বা যথেষ্ট গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করতে হবে, যা শত্রু-সৈন্যরা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। খনন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করাও দরকার ছিল। তাই নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীগণ কঠোর পরিশ্রম সহকারে খনন-কার্যে মশগুল ছিলেন। পেশাব-পায়খানা, পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনেও কাজ বন্ধ রাখা দুরূহ ছিল। তাই উপর্যুপরি ক্ষুধার্ত অবস্থায় এ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল। বাস্তবেও কাজটি এমন ছিল যে, আজকালকার আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত বাহিনীর পক্ষেও এত অল্প সময়ে এ কাজ সমাধা করা সহজ হতো না। কিন্তু এখানে ঈমানী শক্তি কার্য-কর ছিল। তাই অতি সহজেই কাজ সমাধা হয়ে গেলো।

হযরত নবী করীম (সা)-ও একজন সৈনিক হিসাবে খননকার্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে পরিখার এক অংশে একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড বের হলো। এ অংশে নিয়োজিত সাহাবীগণ সর্বশক্তি ব্যয় করেও প্রস্তরখণ্ডটি ভেঙ্গে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা মূল পরিকল্পনাকারী হযরত সালমান ফারসী (রা)-কে হযরত নবী করীম (সা)-এর কাছে সংবাদ দিয়ে পাঠালেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং লোহার কোদাল হাতে নিয়ে প্রস্তরখণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করতেই তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো এবং একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হলো। এ স্ফুলিঙ্গের আলোকচ্ছটা বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। হযরত নবী করীম (সা) বললেন ঃ এ আলোকচ্ছটায় আমাকে হীরা ও পারস্য সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে। এরপর দ্বিতীয়বার আঘাত করতেই আরেকটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হলো। তিনি বললেন ঃ এ আলোকচ্ছটায়

আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল বর্ণের রাজপ্রাসাদ ও দালান-কোঠা দেখানো হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বার আঘাত করতেই আবার আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেনঃ 'এতে আমাকে সান্‌আ ইয়ামনের সুউচ্চ রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে।' তিনি আরও বললেনঃ "আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেছেন যে, আমার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব দেশ জয় করবে।"

এ সংবাদে মদীনার মুনাফিকরা ঠাট্টা-বিদ্রূপের একটা সুযোগ পেয়ে বসলো। তারা বলতে লাগলোঃ দেখ, প্রাণ বাঁচানোই যাদের পক্ষে দায়, যারা শত্রুর ভয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্র পরিখা খননে ব্যস্ত, তারাই কিনা পারস্য, রোম ও ইয়ামন জয় করার দিবাস্বপ্ন দেখছে! আল্লাহ্ তা'আলা এসব নাদান জালিমদের উত্তরে আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ ۔ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

এতে মুনাজাত ও দোয়ার ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে জাতিসমূহের উত্থান, পতন ও সাম্রাজ্যের পটপরিবর্তনে আল্লাহ্ তা'আলার অপ্রতিহত শক্তি-সামর্থ্য বর্ণিত হয়েছে এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে জগতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কওমে নূহ্, আদ, সামূদ প্রভৃতি অবাধ্য জাতির ধ্বংসকাহিনী সম্পর্কে উদাসীন ও মূর্খ শত্রুদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এরা বাহ্যিক শান-শওকতের পূজা করে। এরা জানে না যে, জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার করায়ত্ত। সম্মান ও অপমান তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও পথের ভিখারীকে রাজ-সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের হাত থেকে রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ পরিখা খননকারী ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের আগামীকাল সিরিয়া, ইরাক ও ইয়ামন সাম্রাজ্যের অধিকারী করে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

ذرہ ذرہ دھر کا پا بستۂ تقدیر ہے
زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے

ভাল ও মন্দের নিরিখঃ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে — بِيَدِكَ الْخَيْرُ অর্থাৎ তোমারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ নিহিত। আয়াতের প্রথমাংশে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেওয়া এবং সম্মান ও অপমান—উভয় দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এ

কারণে এখানেও بيدك الخير والشر বলা স্থানোপযোগী ছিল। অর্থাৎ তোমারই হাতে কল্যাণ এবং অকল্যাণ নিহিত; কিন্তু আয়াতে শুধু 'خير' (কল্যাণ) শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, যে বিষয়কে কোন ব্যক্তি অথবা জাতি অকল্যাণকর বা বিপজ্জনক মনে করে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্য আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের সামগ্রিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা হয়ত মন্দ নয়। জাতিসমূহের উত্থান-পতন এবং বিপদ-পরবর্তী সাফল্য লাভের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরবীর প্রসিদ্ধ কবি মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত কাব্যপংক্তিটি একটি জীবন্ত সত্যরূপে প্রতিভাত হয় مصائب قوم عند قوم فوائد অর্থাৎ এক জাতির জন্য যা বিপদ, অন্য জাতির জন্য তা-ই সাক্ষাৎ রহমত।

জগতে যেসব বস্তুকে খারাপ ও মন্দ মনে করা হয়, তা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ হতে পারে। কিন্তু সমগ্র বিশ্বকে যদি একটি দেহ মনে করে নেওয়া হয়, তবে মন্দ বস্তুগুলো এর মুখমণ্ডলের চামড়া ও চুল বৈ নয়। চামড়া ও চুলকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তা নিঃসন্দেহে বিশ্রী ও কদাকার। কিন্তু একটি সুন্দর মুখমণ্ডলের অংশ হিসাবে তা সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে সহায়ক।

মোট কথা, আমরা যেসব বিষয়কে মন্দ বলি, সেগুলো পুরাপুরি মন্দ নয়— আংশিক মন্দ। বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ব প্রতিপালকের দিকে সম্বন্ধ এবং সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন বস্তু মন্দ নয়। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেনঃ

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں
کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں

এ কারণেই আয়াতের শেষাংশে শুধু خير শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বস্রষ্টার রহস্য ও সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার দিক দিয়ে প্রত্যেক বস্তুই خير তথা কল্যাণ। অকল্যাণ কিছুই নেই।

এ পর্যন্ত প্রথম আয়াত সম্পর্কে আলোচনা শেষ হলো। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, উপাদান-জগতের যাবতীয় শক্তি এবং সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার আয়ত্তাধীন।

দ্বিতীয় আয়াতে নভোমণ্ডলেও আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতার ব্যাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছেঃ

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ—অর্থাৎ আপনি ইচ্ছা করলেই রাত্রির অংশ দিনে প্রবেশ করিয়ে দিনকে বড় করে দেন এবং দিনের অংশ রাত্রিতে প্রবেশ করিয়ে রাত্রিকে বড় করে দেন।

সবাই জানেন যে, দিবারাত্রির ছোট-বড় হওয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নভোমণ্ডল, তৎসংশ্লিষ্ট সর্ব বৃহৎ উপগ্রহ সূর্য এবং সর্বখ্যাত উপগ্রহ চন্দ্র—সবই আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতাধীন। অতএব উপাদান জগত ও অন্যান্য শক্তিও যে আল্লাহ্ তা'আলারই ক্ষমতাধীন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ -

অর্থাৎ আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন। যেমন, ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে মানব সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন। পক্ষান্তরে আপনি মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। যেমন পশু-পক্ষী থেকে ডিম, মানব থেকে বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ।

জীবিত ও মৃতের ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে বিদ্বান ও মূর্খ, পূর্ণ ও অপূর্ণ এবং মু'মিন ও কাফির সবাই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী ক্ষমতা সমগ্র আত্মিক জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের উপর সুস্পষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলেই কাফিরের ঔরসে মু'মিন অথবা মূর্খের ঔরসে বিদ্বান পয়দা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলেই মু'মিনের ঔরসে কাফির এবং বিদ্বানের ঔরসে মূর্খ পয়দা করতে পারেন। তাঁরই ইচ্ছায় আযরের গৃহে খলীলুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন এবং নূহ্ (আ)-এর গৃহে তাঁর ঔরসজাত পুত্র কাফির থেকে যায়, আলিমের সন্তান জাহিল থেকে যায় এবং জাহিলের সন্তান আলিম হয়ে যায়।

আয়াতে সমগ্র সৃষ্ট জগতের ওপর আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র ক্ষমতা কিরূপ প্রাঞ্জল ও মনোরম ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণিত হয়েছে, উপরোক্ত বিবরণ থেকে সহজেই বোঝা যায়। প্রথমে উপাদান জগত এবং তার শক্তি ও রাজত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর নভোমণ্ডল ও তার শক্তিসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। সবশেষে আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সমগ্র বিশ্বশক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তি।

সবশেষে বলা হয়েছে ঃ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ—অর্থাৎ আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান করেন। কোন সৃষ্ট জীব তা জানতে পারে না—যদিও স্রষ্টার খাতায় তা কড়ায়-গণ্ডায় লিখিত থাকে।

আলোচ্য আয়াতের বিশেষ ফযীলত ঃ ইমাম বগভীর নিজস্ব সনদে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফাতিহা, আয়াতুল-কুরসী, সূরা আলে-ইমরানের شهد الله আয়াত শেষ পর্যন্ত এবং قل اللهم আয়াত بغير حساب পর্যন্ত পাঠ করে, আমি তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে স্থান দেব, দৈনিক সত্তর বার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেব, তার সত্তরটি প্রয়োজন মেটাব, শত্রুর কবল থেকে আশ্রয় দেব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে জয়ী করব।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ
يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ
تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ اِنْ تُخْفُوْا
مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا
وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

(২৮) মু'মিনগণ যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কোন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন এবং সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (২৯) বলে দিন, তোমরা যদি মনের কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ্ সে সবই জানতে পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৩০) সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও ; ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে দূরের ব্যবধান হতো! আল্লাহ্ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছেন, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে মুসলমানদের নিষেধ করা হয়েছে এবং এ নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, এরূপ লোকদের আল্লাহ্‌র সাথে কোনরূপ সম্পর্ক থাকবে না। কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব সর্বাবস্থায় হারাম। লেনদেনের স্তরে বাহ্যিক বন্ধুত্ব জায়েয হলেও বিনা প্রয়োজনে তাও পছন্দনীয় নয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুসলমানদের উচিত (বাহ্যিক ও আন্তরিক কোন ভাবেই) কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা, মুসলমানদের বাদ দিয়ে। (এ বাদ দেওয়া দুই প্রকারে হতে পারে---প্রথম মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব না রেখে, দ্বিতীয় মুসলমান ও কাফির উভয়ের সাথে বন্ধুত্ব

রেখে—উভয় প্রকার বাদ দেয়া নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত)। যে ব্যক্তি এরূপ (কাজ) করবে, সে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের কোন স্তরেই নয়। (কেননা, পরস্পরে শত্রু—এমন দুজনের মধ্য থেকে একজনের সাথে বন্ধুত্ব করার পর অপর জনের সাথেও বন্ধুত্বের দাবী করা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না)। কিন্তু এমতাবস্থায় (বাহ্যিক বন্ধুত্বের অনুমতি আছে,) যখন তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোনরূপ (বিপদের) আশংকা কর। (এরূপ ক্ষেত্রে বিপদাশংকা দূর করা প্রয়োজন) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় (মহান সত্তা) থেকে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করেন। (অর্থাৎ তাঁর সত্তাকে ভয় করে বিধি-বিধান লংঘন করো না!) আল্লাহ্‌র কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। (তখনকার শাস্তিকে ভয় করা অত্যাবশ্যক।) আপনি (তাদের) বলে দিন ঃ যদি তোমরা মনের মধ্যে গোপন রাখ অথবা (মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা) প্রকাশ করে দাও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা (সর্বাবস্থায়) তা জানেন। (আর এরই কি বিশেষত্ব) তিনি তো সব কিছুই জানেন, যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে রয়েছে। (কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নয়।) এবং (জানার সাথে সাথে) আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুর উপর সর্বময় ক্ষমতাও রাখেন। (সুতরাং তোমরা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে কোন কুকর্ম করলে তিনি তোমাদের শাস্তি দিতে পারেন। সে দিন (এমন হবে যে,) প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব সৎকর্মকে সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পাবে এবং মন্দ কর্মকে (ও দেখতে পাবে, সেদিন) কামনা করবে যে, তার মধ্যে ও এ দিনের মধ্যে অনেক দূরবর্তী ব্যবধান থাকলেই ভাল হতো (যাতে নিজ চোখে নিজের কুকর্ম দেখতে হতো না) এবং (তোমাদের পুনর্বার বলা হচ্ছে) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় (মহান) সত্তা থেকে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করছেন। (এ ভয় প্রদর্শনের কারণ এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত দয়ালু বান্দাদের (অবস্থার) প্রতি। (এ দয়ার কারণে তিনি চান যে, বান্দা আখিরাতের শাস্তি থেকে বেঁচে থাক। শাস্তি থেকে বাঁচার পন্থা হলো, কুকর্ম ত্যাগ করা। ভয় প্রদর্শন ব্যতীত অশোভন কর্ম ত্যাগ করা অভ্যাসগতভাবে হয় না। তাই তিনি ভয় প্রদর্শন করেন। সুতরাং এ ভয় প্রদর্শন সাক্ষাৎ স্নেহ ও দয়া)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অ-মুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত কোরআনে এ সম্পর্কিত অনেক আয়াত বিদ্যমান রয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ -

—"হে মু'মিনগণ! আমার ও তোমাদের শত্রু অর্থাৎ কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তাদের কাছে তোমরা বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে।" উক্ত সূরার শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ০—যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ০

"হে মু'মিনগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। কারণ, তারা পরস্পরে একে অন্যের বন্ধু (মুসলমানদের সাথে তাদের কোন বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি নেই)। যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।"

সূরা মুজাদালায় বলা হয়েছে ঃ

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ০

অর্থাৎ আপনি আল্লাহ্ ও বিচার দিবসে বিশ্বাসী লোকদের পাবেন না যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করে যদিও বিরোধীরা তাদের পিতা হয়, পুত্র হয়, ভাই হয় অথবা পারিবারের লোকজন হয়।

পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত ঃ এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের বহু আয়াতে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখেশুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মুসলমানদের ধর্মে কি অন্য ধর্মালম্বীদের সাথে সদাচার প্রদর্শনেরও কোন অবকাশ নেই, পক্ষান্তরে এর বিপরীতে কোরআনের অনেক আয়াত, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবীর আচরণ থেকে অ-মুসলিমদের সাথে দয়া, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমন এমন ঘটনাবলীও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল। এসব দেখে একজন স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানও এক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশাবলীতে পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘর্ষ অনুভব করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার কোরআনী শিক্ষার প্রতি অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কোরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্র করে গভীরভাবে চিন্তা করলে অ-মুসলিমদের অভিযোগও দূর হয়ে যায় এবং আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ উদ্দেশ্যে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান

করা হচ্ছে। এতে বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ জানা যাবে। আরো জানা যাবে যে,এদের মধ্যে কোন্ স্তরটি জায়েয এবং কোন্‌টি না-জায়েয। যে স্তরটি জায়েয তার কারণ কি কি?

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি স্তর হলো আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অমুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়।

দ্বিতীয়, সমবেদনার স্তর। এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে এবং যুদ্ধরত অ-মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অ-মুসলমানদের সাথেই স্থাপন করা জায়েয।

সূরা মুমতাহিনার অষ্টম আয়াতে এ সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ ۝

অর্থাৎ "যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদের বহিষ্কার করেনি, তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেন না।"

তৃতীয়, সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা করা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অ-মুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। তবে যদি তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করতে চাও, তাহলে জায়েয। সৌজন্যভাবও বন্ধুত্বের আকারে হয়ে থাকে। এজন্য একে বন্ধুত্ব থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।

—(বয়ানুল-কোরআন)

চতুর্থ, লেনদেনের স্তর অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব অ-মুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তবে জায়েয নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা), খোলাফায়ে-রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকহ্‌বিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফিরদের হাতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যেরই অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকরি প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা সবই জায়েয।

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন কাফিরের

সাথে কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। তবে অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফির ছাড়া সবার বেলায়ই জায়েয। এমনিভাবে বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা ও সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার সবার সাথেই জায়েয রয়েছে; তবে এর উদ্দেশ্য অতিথির আতিথেয়তা অথবা অ-মুসলমানকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হতে হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) 'রাহমাতুল্লিল-আলামীন' হয়ে জগতে আগমন করেন। তিনি অ-মুসলমানদের সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার নযীর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে শত্রুরা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করেন। এরপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে সব শত্রু তাঁর করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একথা বলে সবাইকে মুক্ত করে দেন যে, لا تثريب عليكم اليوم অর্থাৎ আজ তোমাদের শুধু ক্ষমাই করা হচ্ছে না, বরং অতীত উৎপীড়নের কারণে তোমাদের কোনরূপ ভর্ৎসনাও করা হবে না। অ-মুসলিম যুদ্ধবন্দী হাতে আসার পর তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না। কাফিররা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল কিন্তু তাঁর হাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কখনও উত্থিত হয়নি। মুখে বদ-দোয়াও তিনি করেন নি। অ-মুসলিম বনু-সাকীফের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি মসজিদে-নববীতে তাদের অবস্থান করতে দেন---যা ছিল মুসলমানদের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান।

ফারূকে-আযম রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের মত অ-মুসলমান দরিদ্র যিম্মীদেরও সরকারী ধনাগার থেকে ভাতা প্রদান করতেন। খোলাফায়ে-রাশেদীন ও সাহাবায়ে-কিরামের কাজ-কর্মের মধ্যে এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছিল সহানুভূতি, সৌজন্য ও লেনদেনমূলক ব্যবহার---নিষিদ্ধ বন্ধুত্ব নয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অ-মুসলিমদের জন্য কতটুকু উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে। অপরদিকে বন্ধুত্ব বর্জনের আয়াত থেকে সৃষ্ট বাহ্যিক পরস্পর বিরোধিতাও দূর হয়ে গেলো!

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোরআন কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন? কোন অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক জায়েয না রাখার রহস্য কি? এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের বুকে মানুষের অস্তিত্ব সাধারণ জীব-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষ ও লতা-পাতার মত নয় যে, জন্মলাভ করবে, বড় হবে, এরপর মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং ইসলাম মনে করে যে, মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন। মানুষের খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ এমন কি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশ্যের চারপাশে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষণ তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যের বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ। মওলানা রূমী চমৎকার বলেছেন ঃ

زندگی از بہر ذکر و بندگی ست
بے عبادت زندگی شرمندگی ست

যে মানুষ এ উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে পড়ে, মওলানা রূমী ও তত্ত্বজ্ঞানিগণের মতে সে মানুষ নয়।

انچہ می بینی خلاف ادم اند ــ نیستند ادم غلاف ادم اند

কোরআন মানুষের কাছ থেকে এ উদ্দেশ্যের স্বীকারোক্তি এভাবে নিয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

'বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র জন্য।'

আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের আনুগত্য ও ইবাদতই যখন মানব-জীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের কাজ-কারবার, রাজ্য শাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী, সে মানবতার প্রধান শত্রু। এ শত্রুতায় শয়তান সবার অগ্রে। তাই কোরআন বলে ঃ اِنَّ الشَّیْطٰنَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْہُ عَدُوًّا

—অর্থাৎ "শয়তান তোমাদের শত্রু। তার শত্রুতা সব সময় স্মরণ রাখবে।"

এমনিভাবে যারা শয়তানী কুমন্ত্রণার অনুসারী এবং পয়গম্বরগণের আনীত আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধী, তাদের সাথে সে ব্যক্তির আন্তরিক বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি কিছুতেই সম্ভব নয়, যার জীবন উদ্দেশ্যমূলক এবং যার বন্ধুত্ব, শত্রুতা, একাত্মতা, বিরোধিতা সবই এ উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্পিত।

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ من احب للّٰہ وابغض للّٰہ فقد استکمل ایمانہ—অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।' এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অতএব, মু'মিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, যে এ উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহ্‌র অনুগত। এ কারণে কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে কোরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা কাফিরদেরই অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ স্বীয় মহান সত্তা থেকে তোমাদের ভয় প্রদর্শন করেন। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফিরদের আন্তরিক বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌কে

অসন্তুষ্ট করবে না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেন না। সুতরাং বাস্তবে কেউ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রেখে মুখে তা অস্বীকার করতে পারে। এ কারণে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকিফহাল। অস্বীকৃতি ও অপকৌশল তাঁর সামনে অচল।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

(৩১) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহলে আমার পথে চল, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদের সকল পাপ মার্জনা করে দেন। আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, দয়ালু। (৩২) বলুন, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্ কাফিরদের ভালবাসেন না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ ওয়াজিব হওয়ার বিষয় এবং কুফরের নিন্দা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে রিসালত ও রসূলের অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে, যাতে বোঝা যায় যে, তওহীদ অস্বীকার করার ন্যায় রিসালত অস্বীকার করাও কুফর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (লোকদের) বলে দিন ঃ যদি তোমরা (নিজেদের দাবীতে) আল্লাহ্র সাথে ভালবাসা রাখ এবং সে ভালবাসার কারণে আল্লাহ্র ভালবাসাও পেতে চাও তবে তোমরা এ উদ্দেশ্য হাসিলের প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে আমার অনুসরণ কর। (কারণ, আমি বিশেষভাবে এ শিক্ষার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। যদি এরূপ কর,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভালবাসতে শুরু করবেন এবং তোমাদের সব গোনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন; (কেননা, আমি এ ক্ষমার পদ্ধতিও শিক্ষা দেই। এ পদ্ধতি অনুশীলন করলে অবশ্যই ওয়াদা অনুযায়ী গোনাহ্ মাফ হবে। উদাহরণত তওবা করা, আল্লাহ্র হক নষ্ট করে থাকলে তা আদায় করা এবং বান্দার হক আদায় করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া।) আল্লাহ্ তা'আলা খুবই ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। আপনি (আরও) বলে দিন ঃ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর (কারণ, আসল উদ্দেশ্য তাই) এবং রসূলের (আনুগত্য কর। অর্থাৎ এদিক দিয়ে আমার আনুগত্য করা জরুরী যে, আমি আল্লাহ্র রসূল। আমার মাধ্যমে তিনি স্বীয় আনুগত্যের পন্থা বর্ণনা করেছেন।) অতঃপর (এতেও) যদি তারা (আপনার আনুগত্য অর্থাৎ কমপক্ষে রিসালতের বিশ্বাস থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (তারা শুনে নিক যে,) আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের ভালবাসেন না। (এমতাবস্থায় তারা হবে কাফির। সুতরাং আল্লাহ্কে ভালবাসার দাবী অথবা আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিছক অর্থহীন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভালবাসা একটি গোপন বিষয়। কারও প্রতি কারও ভালবাসা আছে কি না, অল্প আছে কি বেশী আছে তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হলো অবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে জেনে নেওয়া। যারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসার দাবীদার এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী, আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ জগতে যদি কেউ পরম প্রভুর ভালবাসার দাবী করে, তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের কষ্টিপাথরে তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবী যতটুকু সত্য হবে, সে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে এবং তাঁর শিক্ষার আলোকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণে তার অলসতা ও দুর্বলতা সেই পরিমাণে পরিলক্ষিত হবে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করে, সে প্রকৃত-পক্ষে আল্লাহ্‌রই অনুসরণ করে এবং যে তাঁর অবাধ্যতা করে, সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যতা করে। —(তফসীরে-মাযহারী ঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى
الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

(৩৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আদম (আ), নূহ্ (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর পরিবার এবং ইমরানের খানদানকে নির্বাচিত করেছেন। (৩৪) তারা বংশধর ছিল পরস্পরের। আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনা ঃ হযরত নবী করীম (সা)-এর রিসালতে সন্দেহ পোষণ করার কারণে যেসব লোক তাঁর আনুগত্য করতো না আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কিছু নযীর বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনায় হযরত আদম, নূহ্, আলে-ইবরাহীম ও আলে-ইমরানের কথা সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে হযরত ঈসা (আ)-র আলোচনাই আসল উদ্দেশ্য। এর আগে তাঁর মাতা ও মাতামহীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-র বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর রহস্য ও উপযোগিতা পরে বর্ণিত হবে। মোট কথা এই যে, শেষ যমানায় মুসলিম সম্প্রদায়কে হযরত ঈসা (আ)-র সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। এ কারণে তাঁর পরিচয় ও লক্ষণাদির বর্ণনায় কোরআন অন্যান্য পয়গম্বরের তুলনায় অধিক যত্নবান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (নবুয়তের জন্য) মনোনীত করেছেন (হযরত) আদম (আ)-কে, (হযরত) নূহ (আ)-কে, (হযরত) ইবরাহীমের বংশধর (থেকে কিছুসংখ্যক)-কে (যেমন, হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব এবং বনী ইসরাঈলের সব পয়গম্বর—যাঁরা হযরত ইয়াকুবের বংশধর ছিলেন। আমাদের রসূল (সা) হযরত ইসমাঈলের বংশধর ছিলেন)। এবং ইমরানের বংশধর (থেকে কিছু সংখ্যক)-কে। (এই ইমরান হযরত মূসার পিতা হলে বংশধরের অর্থ হবে হযরত মূসা ও হারূন [আ]। আর যদি ইনি মারইয়ামের পিতা ইমরান হন, তবে বংশধরের অর্থ হবে হযরত ঈসা-ইবনে মারইয়াম। মোট কথা, নবুয়তের জন্য তাঁদেরকে) বিশ্ববাসীর ওপর মনোনীত করেছেন। তাঁরা একে অপরের সন্তান। (যেমন, সবাই হযরত আদমের সন্তান এবং সবাই হযরত নূহের সন্তান। ইমরানের বংশধরও ইবরাহীমের সন্তান)। আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (সবার কথা শোনেন, সবার অবস্থা জানেন। যার কথা ও কাজ নবুয়তের উপযুক্ত দেখেছেন, তাঁকে নবী করেছেন)।

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ
رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثٰى ۚ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۚ وَلَيْسَ
الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

(৩৫) ইমরানের স্ত্রী যখন বললো, হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সকল কিছু থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। (৩৬) অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো—বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুত কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা ভালই জানেন! সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই! আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে, তার সন্তান-সন্ততিকে তোমার আশ্রয়ে দিলাম—অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর) যখন ইমরান (মারইয়ামের পিতা)-এর স্ত্রী গর্ভাবস্থায় (আল্লাহ্ তা'আলাকে) বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার (ইবাদতের) জন্য এই সন্তানের

মানত করছি, যে আমার গর্ভে আছে সে (আল্লাহ্‌র ঘরের সেবার উদ্দেশ্যে) মুক্ত থাকবে। (এবং আমি তাকে নিজের কাজে আবদ্ধ রাখব না।) অতএব, আপনি (একে) আমার পক্ষ থেকে কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী (আমার প্রার্থনা শুনছেন এবং আমার নিয়ত জানেন)। অতঃপর যখন সে কন্যা প্রসব করল (তখন এই ভেবে দুঃখিত হল যে, এ তো বায়তুল-মুকাদ্দাসের সেবার উপযুক্ত নয়, এ কাজটি যে পুরুষদের। তাই আক্ষেপ করে) বললো ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি তো কন্যা প্রসব করলাম। (আল্লাহ্‌ বলেন, সে নিজ ধারণা অনুযায়ী আক্ষেপ করছিল) অথচ আল্লাহ্‌ (এ কন্যার অবস্থা) বেশী জানেন—যা সে প্রসব করেছিল। এবং (কোনরূপেই) পুত্র (যা সে চেয়েছিল) কন্যার সমান নয় ; (বরং কন্যাই শ্রেষ্ঠ। কারণ সে অসাধারণ মহিমা ও কল্যাণের অধিকারিণী ছিল। এ পর্যন্ত মাঝখানে আল্লাহ্‌র উক্তি ছিল। এখন আবার ইমরান-পত্নীর উক্তি বর্ণিত হচ্ছে)। আমি এ কন্যার নাম রেখেছি মারইয়াম। আমি তাকে ও তার সন্তান-সন্ততিকে (কোন সময় হলে) আপনার আশ্রয়ে (ও হেফাযত) অর্পণ করছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে প্রচলিত ইবাদত-পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্‌র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজ ছিল। সন্তানদের মধ্য থেকে কোন একটিকে আল্লাহ্‌র কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো এবং তাকে কোন পার্থিব কাজে নিযুক্ত করা হতো না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী মারইয়ামের জননী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে বায়তুল-মুকাদ্দাসের খিদমতে নিয়োজিত করা হবে এবং অন্য কোন জাগতিক কাজে নিযুক্ত করা হবে না। কিন্তু যখন তিনি কন্যা প্রসব করলেন, তখন এই ভেবে আক্ষেপ করতে লাগলেন যে, কন্যা দ্বারা তো এ কাজ সম্ভবপর নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর আন্তরিকতার বরকতে কন্যাকেই কবুল করে নিলেন এবং সারা বিশ্বের কন্যাদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করলেন।

এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের ব্যাপারে জননীর বিশেষ অধিকার রয়েছে? এরূপ না হলে মারইয়ামের জননী মানত করতে পারতেন না। এতে আরও বোঝা যায় যে, সন্তানের নাম নিজে প্রস্তাব করার অধিকার জননীরও রয়েছে।—(জাস্‌সাস)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا
زَكَرِيَّا ۭ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ
قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۭ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(৩৭) অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন—অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন—'মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?' তিনি বলতেন, 'এসব আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোট কথা এই যে, মারইয়াম-জননী মারইয়াম [আ]-কে নিয়ে মসজিদ বায়তুল-মুকাদ্দাসে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদে ইবাদতকারীদের বললেন ঃ আমি এ শিশু কন্যাকে আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করেছি। তাই আমি একে নিজের কাছে রাখতে পারি না। আপনারা এর দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। মসজিদে ইবাদতকারীদের মধ্যে হযরত যাকারিয়া [আ]-ও ছিলেন। মসজিদের ইমাম ছিলেন হযরত ইমরান। কিন্তু তিনি স্ত্রীর গর্ভাবস্থায়ই ইন্তিকাল করেন। নতুবা কন্যার দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরই ছিল অগ্রাধিকার। কারণ তিনি ছিলেন একাধারে কন্যার পিতা ও মসজিদের ইমাম। এ কারণে বায়তুল-মুকাদ্দাসের ইবাদতকারীদের প্রত্যেকেই কন্যাকে লালন-পালন করতে আগ্রহী ছিলেন। হযরত যাকারিয়া [আ] স্বীয় অগ্রাধিকারের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন ঃ আমার গৃহে কন্যার খালা রয়েছে। খালা মায়ের মতই। কাজেই মায়ের পরে কন্যাকে রাখার ব্যাপারে খালার অধিকার বেশী। কিন্তু অন্যরা এ অগ্রাধিকার মেনে নিতে স্বীকৃত হলো না। লটারীর মাধ্যমে ব্যাপারটি মীমাংসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। লটারীর যে পদ্ধতি স্থির করা হলো, তাও ছিল অভিনব। পরে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হবে। লটারীতেও হযরত যাকারিয়া [আ] জিতে গেলেন।

তিনি হযরত মারইয়ামকে পেয়ে গেলেন। কোন কোন রিওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করে মারইয়ামকে দুধ পান করালেন। আবার কোন কোন রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, তাঁকে দুধ পান করানোর প্রয়োজনই দেখা দেয়নি। মোট কথা, হযরত মারইয়াম লালিত-পালিত হতে লাগলেন। মসজিদ-সংলগ্ন একটি উত্তম কক্ষে তাঁকে রাখা হলো। কোথাও যেতে হলে হযরত যাকারিয়া কক্ষে তালা লাগিয়ে যেতেন। আবার ফিরে এসে তালা খুলে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে সংক্ষেপে এ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে)।

অতএব, তাঁকে (মারইয়ামকে) তাঁর পালনকর্তা উত্তম পন্থায় কবুল করে নিলেন এবং উত্তম বর্ধনে তাকে বর্ধিত করলেন। এবং (হযরত) যাকারিয়া (আ) তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলেন। যখনই (হযরত) যাকারিয়া (আ) তাঁর কাছে (সেই উত্তম কক্ষে —যেখানে তাঁকে রাখা হয়েছিল) আগমন করতেন, তখন তাঁর কাছে কিছু পানাহারের বস্তু দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন ঃ হে মারইয়াম, এগুলো তোমার কাছে কোথা থেকে এলো? (অথচ কক্ষ তালাবদ্ধ। বাইরে থেকে কারও আসা-যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মারইয়াম) বলতেন ঃ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে যে অদৃশ্য ধনভাণ্ডার

রয়েছে, তা থেকে)। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অকল্পনীয় রিযিক দান করেন (যেমন এ ক্ষেত্রে শুধু অনুগ্রহবশত বিনাশ্রমে দান করলেন)।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পূত-পবিত্র সন্তান দান কর—নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হযরত যাকারিয়া [আ] হযরত মারইয়ামের লালন-পালনে অসাধারণ খোদায়ী নিদর্শন দেখে নিজের জন্যও দোয়া করলেন)।

এ ক্ষেত্রে (হযরত) যাকারিয়া [আ] স্বীয় পালনকর্তার কাছে দোয়া করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে বিশেষ করে আপনার কাছ থেকে পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শ্রবণকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا—হযরত যাকারিয়া (আ) তখন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। সময়ও ছিল বার্ধক্যের—যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্ধক্যের মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে অসময়ে ও অস্থানে দান করার খোদায়ী মহিমা ইতিপূর্বে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই এ যাবত সাহস করে দোয়া করেন নি। কিন্তু এ সময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফলের মওসুম ছাড়াই মারইয়ামকে ফল দান করছেন, তখনই তাঁর মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো এবং তিনি দোয়া করার সাহস পেলেন। যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মওসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন।

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً—এতে বোঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্য দোয়া করা পয়গম্বর ও সজ্জনদের সুন্নত।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

—وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

অর্থাৎ—হযরত নবী করীম (সা)-কে যেরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা হয়েছে, তদ্রূপ এই নিয়ামত পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও দেওয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি কোন পন্থায় সন্তান জন্মগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে সে শুধু স্বভাবধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে না; বরং পয়গম্বরের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুন্নত থেকেও বঞ্চিত হয়। হযরত নবী করীম (সা) বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্নটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাই যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ ও সন্তান গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি দেন নি। তিনি বলেন ঃ

النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى وتزوجوا فانى مكاثر بكم الامم -

অর্থাৎ "বিবাহ আমার সুন্নত। যে ব্যক্তি এ সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা, তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো।"

যারা স্ত্রী ও সন্তান লাভ এবং তাদের সৎ হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করে, এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রশংসা করে বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দারা এরূপ দোয়া করে ঃ হে পালনকর্তা! আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর, যাদের দেখে চক্ষু শীতল হয়—অন্তর প্রফুল্ল হয়।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এখানে চক্ষু শীতল হওয়ার অর্থ স্ত্রী ও সন্তানের আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যে মশগুল দেখা।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার উম্মে সুলায়ম (আনাস-জননী) হযরত নবী করীম (সা)-কে অনুরোধ করে বললেন ঃ আপনি আনাসের জন্য কোন দোয়া করুন। হযরত (সা) নিম্নোক্ত দোয়া করলেন ঃ اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته —অর্থাৎ "আল্লাহ্, তার (আনাসের) ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি কর এবং তাকে প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে বরকত দান কর।"

এ দোয়ার প্রভাবেই হযরত আনাসের সন্তানদের সংখ্যা একশতের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রচুর আর্থিক সচ্ছলতাও দান করেছিলেন।

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ
بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(৩৯) যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন তিনি মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন, ফেরেশতারা তখন তাকে ডেকে বললেন—আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্ইয়ার (অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া নামে পুত্র হওয়ার) সুসংবাদ দিচ্ছেন। তার অবস্থা হবে এই যে, তিনি 'কলেমাতুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র বাণীর (অর্থাৎ হযরত ঈসা [আ]-র নবুয়তের) সত্যায়নকারী হবেন, (দ্বিতীয়ত) অনুসৃত (অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে) হবেন, (তৃতীয়ত) কাম বাসনামুক্ত হবেন, (চতুর্থত) পয়গম্বর এবং (পঞ্চমত) সৎকর্মশীল হবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كلمة الله (আল্লাহ্র বাণী)—হযরত ঈসা (আ)-কে 'কলেমাতুল্লাহ্' বলার কারণ এই যে, তিনি শুধু আল্লাহ্র নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

حصورا—এটা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর তৃতীয় গুণ। এর অর্থ যাবতীয় কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা। উদাহরণত উত্তম পানাহার, উত্তম পোশাক পরিধান এবং বিবাহ ইত্যাদি। এ গুণটি প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যত মনে হয় যে, এটাই উত্তম পন্থা। অথচ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারও অবস্থা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-র মত হয় অর্থাৎ অন্তরে পরকালের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করার মত অবসর না থাকে, তবে তার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। এ কারণেই যে সব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, من استطاع منكم الباءة অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম—নতুবা নয়। —(বয়ানুল-কোরআন)

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ؕ
قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْٓ اٰيَةً ؕ
قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ
رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

(৪০) তিনি বললেন, 'হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র-সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা।' তিনি বললেন, আল্লাহ্ এমনিভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। (৪১) তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিত করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হযরত যাকারিয়া [আ] আল্লাহ্ সকাশে) আরয করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! আমার পুত্র কিভাবে হবে, অথচ আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি এবং আমার স্ত্রীও (বার্ধক্যের কারণে) সন্তান প্রসবের যোগ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলা (উত্তরে) বললেন ঃ এমতাবস্থায়ই পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। কেননা, আল্লাহ্ যা চান, তাই করেন। তিনি আরয করলেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, (তাহলে) আমার জন্য কোন নিদর্শন ঠিক করে দিন (যাতে বোঝা যায় যে, এখন গর্ভ সঞ্চার হয়েছে)। আল্লাহ্ বললেন ঃ তোমার নিদর্শন এই যে, তখন তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না (হাত অথবা মাথায়) ইঙ্গিত ছাড়া। (এ নিদর্শন দেখেই বুঝে নেবে যে, এখন স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়েছে। মানুষের সাথে কথা বলার শক্তি রহিত হয়ে যাওয়ার সময়ও তুমি আল্লাহ্র যিকর করতে সক্ষম হবে। সুতরাং) আল্লাহ্কে (মনে মনে) খুব স্মরণ করবে এবং (মুখেও) আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করবে সন্ধ্যাকালে এবং সকালে (কেননা তখনও আল্লাহ্র যিকরের শক্তি পুরাপুরি বহাল থাকবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত যাকারিয়া (আ)-র দোয়া ও তার রহস্য ঃ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ

—হযরত যাকারিয়া (আ) খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিপূর্বে এর নমুনা প্রত্যক্ষ করে নিজে দোয়াও করেছিলেন। এ ছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি

অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও 'কিভাবে আমার পুত্র হবে' বলার মানে কি ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ জিজ্ঞাসা আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্যে সন্দেহের কারণে ছিল না। বরং তিনি পুত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে যে বার্ধক্য অবস্থায় আছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে? আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেন যে, না, তোমরা বার্ধক্যাবস্থায়ই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে। সুতরাং আয়াতের অর্থে কোনরূপ জটিলতা নেই। —(বয়ানুল কোরআন)

قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا

প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে হযরত যাকারিয়া (আ) নিদর্শন জানতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ নিদর্শন দিলেন যে, তিনদিন পর্যন্ত তুমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে সমর্থ হবে না।

এ নিদর্শনের মধ্যে সূক্ষ্মতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নিদর্শন চাওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এমন নিদর্শন দিলেন যে, তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া হযরত যাকারিয়া অন্য কোন কাজের যোগ্যই থাকবেন না। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত নিদর্শনও পাওয়া গেলো এবং উদ্দেশ্যও পুরাপুরি অর্জিত হলো। এ যেন একই সঙ্গে দুই উপকার লাভ।—(বয়ানুল-কোরআন)

اِلَّا رَمْزًا—এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইঙ্গিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সা) এক বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ اَيْنَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ কোথায়)? উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলো। হযরত (সা) বললেন ঃ এ বাঁদী মুসলমান।—(কুরতুবী)

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ۝

(৪২) আর যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে নির্বাচিত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব-নারী সমাজের

ঊর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। (৪৩) হে মারইয়াম! তোমার পালনকর্তার ইবাদত কর এবং রুকূকারীদের সাথে সিজদা ও রুকূ কর।'

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে সময়টিও স্মরণযোগ্য), যখন ফেরেশতারা (হযরত মারইয়াম [আ]-কে) বললো ঃ হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে মনোনীত (অর্থাৎ মকবুল) করেছেন এবং (সকল অপছন্দনীয় কর্ম ও আচরণ থেকে) পবিত্র করেছেন। এবং (এ মকবুল করাও দুই-একজন নারীর দিক দিয়ে নয়; বরং তৎকালীন) সারা বিশ্বের নারীদের মোকাবিলায় তোমাকে মনোনীত করেছেন। (ফেরেশতারা আরও বলল ঃ) হে মারইয়াম, তোমার পালনকর্তার আনুগত্য করতে থাক, সিজদা (অর্থাৎ নামায আদায়) কর এবং নামাযে রুকূকারীদের সাথে রুকূও কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ—এর অর্থ তৎকালীন সারা বিশ্বের নারী সমাজ। কাজেই سيدة نساء اهل الجنة فاطمة—(জান্নাতের মহিলাদের নেত্রী হবেন ফাতিমা)—এ হাদীসটি উক্ত আয়াতের পরিপন্থী নয়।

وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ—এখানে اركعى এর সাথে مَعَ الرّٰكِعِيْنَ যুক্ত করা হয়েছে; কিন্তু وَاسْجُدِىْ এর সঙ্গে مع الساجدين যুক্ত করা হয়নি। এতে বাহ্যত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুকূ করার ব্যাপারে মানুষ সাধারণত বেশী যত্নবান নয়; বরং সামান্য একটু ঝুঁকেই সোজা হয়ে যায়। এ ধরনের রুকূ কিয়ামের (অর্থাৎ দণ্ডায়মান অবস্থার) অধিক নিকটবর্তী। এ কারণে বাহ্যত মনে হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা الراكعين যুক্ত করে নমুনা বলে দিয়েছেন যে, তোমার রুকূ পুরাপুরি রুকূকারীদের মত হওয়া দরকার।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۭ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۠ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ۝

(৪৪) এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরে বর্ণিত) এ কাহিনী (জানার বাহ্যিক কোন উপায় না থাকার কারণে রসূলুল্লাহ্ [সা]-এর দিক দিয়ে) অন্যতম অদৃশ্য সংবাদ, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি (এ উপায়ে আপনি এ সংবাদ জেনে অন্যদের বলেন! যারা হযরত মারইয়াম [আ]-কে রাখার ব্যাপারে মতবিরোধ করছিল, যার মীমাংসা শেষ পর্যন্ত লটারিযোগে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল)। আপনি তাদের কাছে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা (লটারীতে) আপন আপন কলম (পানিতে) নিক্ষেপ করছিল (লটারির উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ের মীমাংসা করা) যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মারইয়াম (আ)-এর লালন-পালন করবে? (আপনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না) এবং আপনি তাদের কাছে তখনও উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা (লটারির পূর্বে এ ব্যাপারে) পরস্পর মতবিরোধ করছিল (যা দূর করার জন্য লটারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসব সংবাদ জানার জন্য অন্য কোন মাধ্যমও যে নেই, তাও তো নিশ্চিত ব্যাপার। সুতরাং এমতাবস্থায় এ অদৃশ্য সংবাদগুলো আপনার নবুয়তের প্রমাণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামী শরীয়তে লটারির নির্দেশ এই যে, হানাফী মযহাব মতে যেসব হকের কারণ শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সে সব হকের মীমাংসা লটারিযোগে করা না-জায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণত শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারিযোগে করা এবং লটারিতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেওয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারিযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেওয়া। পক্ষান্তরে যে সব হকের কারণ জনগণের রায়ের উপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারিযোগে করা জায়েয, যথা কোন্ শরীককে কোন্ অংশ দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে লটারির মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ ও অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেওয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারি ছাড়াই উভয় পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিত অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিত, তবুও তা জায়েয হতো।—(বয়ানুল কোরআন) অর্থাৎ যেক্ষেত্রে সব শরীকের অংশ সমান সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্য নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লটারি জায়েয।

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ

اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٤٦﴾

(৪৫) যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ্-মারইয়াম-তনয় ঈসা; দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৬) যখন তিনি মায়ের কোলে থাকবেন এবং যখন পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(স্মরণ কর,) যখন ফেরেশতারা (হযরত মারইয়াম (আ)-কে আরও বললো ঃ হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে একটি বাণীর সুসংবাদ দেন, যা তাঁর পক্ষ থেকে হবে (অর্থাৎ একটি শিশুর সুসংবাদ দেন,---যা পিতার মাধ্যমে না হওয়ার কারণে 'কলেমাতুল্লাহ্' আল্লাহ্র বাণী বলে কথিত হবে)। তাঁর নাম (ও উপাধি) মসীহ্ ঈসা ইবনে মারইয়াম হবে। (তাঁর অবস্থা হবে এই যে,) তিনি ইহকালে, (আল্লাহ্র কাছে) মর্যাদাবান হবেন (অর্থাৎ নবুয়ত লাভ করবেন) এবং পরকালে (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের মু'মিনদের ব্যাপারে শাফা'আতের অধিকারী হবেন)। এছাড়া (নবুয়ত ও শাফা'আতের অধিকারসহ---যার সম্পর্ক অন্যের সাথেও---ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠারও অধিকারী হবেন। অর্থাৎ) আল্লাহ্র নৈকট্যশীলগণের অন্যতম হবেন। তিনি (মু'জিযারও অধিকারী হবেন) মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবেন দোলনাতে (অর্থাৎ সম্পূর্ণ শৈশবাবস্থায়ও) এবং পরিণত বয়সেও (উভয় অবস্থাতে একই রূপ)। (উভয় কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য হবে না) এবং (তিনি) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সৎকর্মশীলদের অন্যতম হবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ঈসা (আ)-র অবতরণের একটি প্রমাণ ঃ আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-র একটি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি শৈশবে যে বয়সে কোন শিশু কথা বলতে সক্ষম হয় না, তখন দোলনায়ও কথা বলবেন। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, জন্মের পর যখন ইহুদীরা মারইয়ামের প্রতি অপবাদ প্রদানপূর্বক ভর্ৎসনা করতে থাকে, তখন সদ্যজাত শিশু ঈসা (আ) বলে ওঠেন ঃ আমি আল্লাহ্র বান্দা। এতদসঙ্গে আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যখন তিনি প্রৌঢ় বয়সের হবেন, তখনও মানুষের সাথে কথা বলবেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শৈশবাবস্থায়

কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ব্যাপার—যার উল্লেখ এক্ষেত্রে সমীচীন হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে কথা বলা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। মু'মিন, কাফির, পণ্ডিত, মূর্খ—সবাই এ বয়সে কথা বলে। কাজেই এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুণ হিসাবে এটা উল্লেখ করার অর্থ কি ?

এ প্রশ্নের এক উত্তর বয়ানুল-কোরআনের সার-ব্যাখ্যায় দেওয়া হয়েছে যে, 'শৈশবাবস্থায় কথা বলা' বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে 'প্রৌঢ় বয়সের কথা' উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তাও শিশুসুলভ হবে না; বরং প্রৌঢ় লোকদের মত জ্ঞানীসুলভ, মেধাবীসুলভ, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হবে।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এখানে প্রৌঢ় বয়সের কথাবার্তার উল্লেখ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ করা হয়েছে। তা এই যে, ইসলামী ও কোরআনী বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আকাশে উত্তোলন করার সময় তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি ছিল। অর্থাৎ তিনি যৌবনের প্রারম্ভিক কালে উত্তোলিত হয়েছেন। অতএব প্রৌঢ় বয়স—যাকে আরবীতে 'কহল' বলা হয়—তিনি এ জগতে সে বয়স পান নি। কাজেই প্রৌঢ় বয়সে মানুষের সাথে কথা বলা তখনই সম্ভব, যখন তিনি আবার এ জগতে প্রত্যাবর্তন করবেন। এ কারণেই তাঁর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তা বলা যেমন একটি অলৌকিক ব্যাপার, তেমনি প্রৌঢ় বয়সে দুনিয়ায় ফিরে এসে কথাবার্তা বলাও হবে একটা অলৌকিক ব্যাপার।

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

(৪৭) তিনি বললেন, 'পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হবে; আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি!' বললেন, 'এ ভাবেই।' আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন—তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও'। অমনি তা হয়ে যায়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হযরত মারইয়াম (আ) বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা! কিভাবে আমার পুত্র হবে, অথচ কোন (পুরুষ) মানুষ (সহবাসছলে) আমাকে স্পর্শ করেনি! (বৈধ পন্থায় পুরুষ ব্যতীত সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে না। অতএব আমি বুঝতে পারি না যে, শুধু আল্লাহ্র কুদরতে পুত্র জন্মগ্রহণ করবে, না আমাকে বিবাহের আদেশ দেওয়া হবে?) আল্লাহ্ তা'আলা (ফেরেশতাদের মাধ্যমে উত্তরে) বললেন ঃ (পুরুষ ছাড়া) এমনিভাবেই হবে। (কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ কোন কিছু সৃষ্টির

জন্য তাঁর ইচ্ছাই যথেষ্ট—কোন মাধ্যম অথবা বিশেষ উপকরণের প্রয়োজন তাঁর হয় না। তাঁর ইচ্ছার পন্থা এই যে) যখন কোন বস্তু পয়দা করতে চান, তখন তাকে বলেন ঃ সৃষ্টি হয়ে যাও। এতেই (সে বস্তু অস্তিত্ব প্রাপ্ত) হয়ে যায়।

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝٤٨ وَرَسُوْلًا اِلٰى
بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْٓ اَخْلُقُ
لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ
بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٤٩ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝٥٠ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝٥١

(৪৮) আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইন্‌জীল। (৪৯) আর বনী ইসরাঈলদের জন্য রসূল হিসাবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বলবেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায়—আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই—যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৫০) আর এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু, যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৫১) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা—তাঁর ইবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মারইয়াম! এ ভাগ্যবান সন্তানের ফযীলত হবে এই যে,) আল্লাহ্ তাকে (খোদায়ী) গ্রন্থ, গূঢ়তত্ত্ব এবং (বিশেষভাবে) তওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দেবেন, তাকে (সমগ্র) বনী ইসরাঈলের প্রতি রসূল করে (এ বিষয়বস্তু দিয়ে) পাঠাবেন যে, আমি তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণসহ আগমন করেছি। তা এই যে, আমি তোমাদের (বিশ্বাস করার) জন্য কাদামাটি থেকে পাখীর আকৃতির মত আকৃতি গঠন করি। অতঃপর এ (কৃত্রিম আকৃতির মধ্যে) ফুৎকার দেই। এতে সে আল্লাহ্র নির্দেশে (সত্যি সত্যি জীবিত) পাখী হয়ে যায়। (আরও মু'জিযা এই যে,) আমি জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করি এবং আল্লাহ্র নির্দেশে মৃতকে জীবিত করি। (এগুলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় মু'জিযা।) তোমরা যা ভক্ষণ কর (অর্থাৎ ভক্ষণ করে আস) এবং স্বীয় গৃহে সংগ্রহ করে আস, আমি তা বলে দেই। (এটা চতুর্থ মু'জিযা) নিশ্চয় এগুলোর (উল্লিখিত মু'জিযাসমূহের) মধ্যে তোমাদের জন্য, (আমার নবী হওয়ার) যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, যদি তোমরা ঈমান আনতে চাও। আর আমি ঐ গ্রন্থের সত্যায়ন করি, যা আমার পূর্বে (অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন, তওরাতের। আমি এজন্য এসেছি, যাতে এমন কতিপয় বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করি, যা মূসা [আ]-র শরীয়তে) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছিল। (আমার শরীয়তে এগুলোর অবৈধতা রহিত হবে।) আর (আমার এ দাবী বিনা প্রমাণে নয়; বরং আমি প্রমাণ করছি যে,) আমি তোমাদের কাছে (নবুয়তের) প্রমাণ নিয়ে এসেছি। (রহিতকরণের দাবীতে নবীর উক্তিই একটি প্রমাণ।) মোটকথা এই যে, (আমার নবী হওয়া যখন প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন আমার শিক্ষা অনুযায়ী) তোমরা আল্লাহ্কে (নির্দেশ লঙ্ঘনের ব্যাপারে) ভয় কর এবং (ধর্মের ব্যাপারে) আমার অনুগত হও। (আমার ধর্মীয় শিক্ষার সারমর্ম এই যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা (এটা বিশ্বাসগত সার-নির্দেশ)। অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। (এটা কর্মগত সারনির্দেশ) এটাই সরল পথ। (এতে বিশ্বাস ও কর্ম উভয়ের সমাবেশ হয়েছে। এর দ্বারাই মুক্তি ও আল্লাহ্ প্রাপ্তি সম্ভব)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পাখীর আকৃতি গঠন করা তথা চিত্রাঙ্কন করা হযরত ঈসা (আ)-র শরীয়তে বৈধ ছিল। আমাদের শরীয়তে এর বৈধতা রহিত হয়ে গেছে।

فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ
الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۝
رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

(৫২) অতঃপর ঈসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের কুফ্‌রী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেনঃ কারা আছে আল্লাহ্‌র পথে আমাকে সাহায্য করবে? সঙ্গী সাথীরা বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। (৫৩) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদিগকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

উল্লিখিত সুসংবাদের পর হযরত ঈসা (আ) তেমনিভাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং বনী ইসরাঈলের সাথে উল্লিখিত বিষয়বস্তু নিয়ে কথাবার্তা হয় এবং তিনি অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করেন। কিন্তু বনী ইসরাঈল তাঁর নবুয়ত অস্বীকার করে)। অনন্তর যখন ঈসা (আ) তাদের মধ্যে অবিশ্বাস লক্ষ্য করলেন (এবং অবিশ্বাসের সাথে সাথে উপর্যুপরি নির্যাতনও ভোগ করলেন। তখন ঘটনাক্রমে কিছু লোক তাঁর মতাবলম্বী হয়ে যায়। তাঁরাই 'হাওয়ারী' নামে অভিহিত ছিল।) তখন (হাওয়ারীদের) বললেনঃ এমন কেউ আছে কি, যে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (সত্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিপক্ষে) আমার সাহায্যকারী হবে (যাতে ধর্মের কাজে তারা আমার ওপর নির্যাতন চালাতে না পারে)? হাওয়ারীগণ বললোঃ আমরাই আল্লাহ্‌র (ধর্মের) সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি (আপনার আহ্‌বান অনুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আপনি (এ বিষয়ের) সাক্ষী হোন যে, আমরা (আল্লাহ্ তা'আলার ও আপনার) অনুগত। (এরপর তারা অঙ্গীকারকে আরও পাকাপোক্ত করার জন্য মুনাজাতও করল যে,) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা ঐ সব বিষয়ের (অর্থাৎ বিধি-বিধানের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা আপনি অবতীর্ণ করেছেন এবং আমরা এ পয়গম্বরের অনুসরণ করি। তাই (আমাদের ঈমান কবুল করুন এবং) তাদের তালিকায় আমাদের নাম লিপিবদ্ধ করুন, যারা উল্লিখিত বিষয়বস্তুর সাক্ষী দেয় (অর্থাৎ পুরাপুরি মু'মিনের তালিকায়) আমাদের গণ্য করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

حواری শব্দ حور ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন। অভিধানে قَالَ الْحَوَارِيُّونَ—এর অর্থ দেয়ালে চুনকাম করার চুন। পরিভাষায় হযরত ঈসা (আ)-র খাঁটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী —তাঁদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তাঁরা সাদা পোশাক পরিধান করতেন এ জন্য তাঁদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হতো। যেমন, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভক্ত ও সহচরগণের উপাধি ছিল সাহাবী।

কোন কোন তফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দ্বাদশ উল্লেখ করেছেন। 'হাওয়ারী' শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা